জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯

(চূড়ান্ত খসড়া)

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সেপ্টেম্বর ২০০৯

ভূমিকা

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে শিক্ষা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা. আলাপ আলোচনা, পর্যালোচনা-পরিকল্পনা খুব একটা কম হয়নি। ইতিপূর্বে ছয়টি শিক্ষা কমিশন/কমিটিও গঠিত হয়েছে এবং প্রতিবেদন তৈরি হয়েছে। তবে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ ছাড়া এযাবৎ বাংলাদেশে কোনো জাতীয় শিক্ষানীতি প্রবর্তিত হয়নি। তবে এটিও ২০০১ সালে সরকার পরিবর্তনের পর বাস্তবায়ন করা হয়নি। প্রথমে একটি শিক্ষা সংস্কার কমিটি (২০০২), এরপর একটি নয়া জাতীয় শিক্ষা কমিশন (২০০৩) গঠন করা হয়। ওই কমিটি এবং কমিশনও প্রতিবেদন জমা দেয়। বর্তমান কমিটি পূর্বের সবগুলো প্রতিবেদন ও জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ পর্যালোচনা করে। কুদরত-ই খুদা (১৯৭৪), শামসুল হক (১৯৯৭) কমিটির প্রতিবেদন এবং জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ বিশেষভাবে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

একটা উন্নত আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য, একটা সুষম সুস্থ-পরিচ্ছন্ন মানবিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য চাই সর্বজনীন শিক্ষার গভীর ও ব্যাপক আয়োজন। পৃথিবীর উন্নয়ন-অগ্রগতি-প্রগতির ইতিহাস ব্যাপক গণমানুষকে নিরক্ষর রেখে, অজ্ঞানতা-অশিক্ষা-কুশিক্ষার অন্ধকারে রেখে, কোনো জাতি, দেশ, রাষ্ট্র সামনে এগোয়নি, এগুতে পারেনি। এই ধ্রুব সত্যকে বিবেচনায় রেখে স্বাধীনতার ঊষালগ্নে নতুন রাষ্ট্রের পক্ষে সবার জন্য একটা সুষম, গণতান্ত্রিক উপযুক্ত মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা নির্মাণ ও বিকাশের সাংবিধানিক (১৭ ধারা) অঙ্গীকার নির্ধারণ করা হয়। সেই সর্বত্র প্রসারিত মানসম্মত সর্বজনীন শিক্ষার শক্ত ভিত্তির উপর শিক্ষার অন্যান্য স্তরগুলোর উপরিকাঠামো তৈরীর কাজটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য এই উপলব্ধির আলোকে একটি উপযুক্ত শিক্ষানীতি সুপারিশ করার জন্য বাঙালির মহান নেতা, বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে দেশের সর্বপ্রথম শিক্ষা কমিশন কুদরত-ই-খুদা কমিশন গঠিত হয়েছিল। ১৯৭৪ সনে প্রণীত কুদরত-ই-খুদা কমিশনের প্রতিবেদনের আলোকে এবং বিরাজমান বাস্তবতার নিরিখে একটি উপযুক্ত শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার অঙ্গীকার বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের ১৯৯৬ এর নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষণা করা হয় এবং সেই ঘোষণা অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ প্রণয়ন করা হয়, যদিও পরবর্তী জোট সরকার তা বাস্তবায়ন করেনি। এবার রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করার কয়েক মাসের মধ্যেই বর্তমান সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি যুগোপযোগী করার দায়িত্ব দিয়ে একটি কমিটি গঠন করে (সংযোজনী-৬)।

মহাজোট সরকারের প্রধান শরিকদল আওয়ামী লীগের ২০০৮ নির্বাচনী ইশতেহারে দেশে একটি অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল উদার গণতান্ত্রিক কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়া হয়। এই রাষ্ট্রে প্রকৃত সামাজিক ন্যায়-বিচার, নারীর অধিকার ও সুযোগের সমতা, আইনের শাসন, মানবাধিকার, সুশাসন এবং দূষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে । তা বাস্তবায়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হচ্ছে একটা সুপরিকল্পিত

এবং জনকল্যাণে নিবেদিত যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা। আর তা নিশ্চিত হতে পারে একটি সুষম, সুগ্রথিত যুগপোযোগী শিক্ষানীতির মাধ্যমে। একদিকে সুনাগরিক সৃষ্টির তাগিদ এবং অন্যদিকে বিদ্যমান কঠিন আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা ও প্রয়োজনকে সামনে রেখেই নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি এই নীতি প্রণয়নের কাজে হাত দেয়।

শিক্ষানীতি ২০০৯ প্রণয়ন ব্যাপক মতামত গ্রহণ ভিত্তিক করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ৫৬টি সংস্থা ও সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাদা আলাদা বিস্তারিত মত বিনিময় করা হয়। এছাড়া অনেক ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর কাছ থেকে লিখিত মতামতও কমিটি লাভ করে। তদুপরি ৬টি বিভাগে সকল স্তরের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মতবিনিময় সভার প্রত্যেকটিতে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির এক বা একাধিক সদস্য অংশগ্রহণ করেন এবং সুপারিশ গ্রহণ করেন। এই নীতি প্রণয়নে প্রাপ্ত এসকল মতামত বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। আর কমিটির সদস্যগণও তাদের বিশেষজ্ঞ মতামত ও অভিজ্ঞতার আলোকে এই নীতি প্রণয়নে অবদান রাখেন।

কমিটি ৩রা মে ২০০৯ তারিখে প্রথম মিটিং-এ বসে এবং ২রা সেপ্টেম্বর ২০০৯ তারিখে এর কাজ সম্পন্ন করে। বিভিন্ন উৎস থেকে মতামত ও তথ্য গ্রহণ ও বিবেচনা এবং সদস্যদের নিজেদের মতামত তুলে ধরার জন্য পূর্ণ কমিটি ২৩টি সভা করে। প্রাপ্ত সব মতামত ও তথ্য বিশ্লেষণ করে খসড়া তৈরি এবং এর পরিমার্জন করার দায়িত্ব পালন করে কমিটির কো-চেয়ারম্যান কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ (আহবায়ক), সদস্য মুহম্মদ জাফর ইকবাল ও সদস্য-সচিব শেখ ইকরামুল কবিরকে নিয়ে গঠিত খসড়া প্রণয়ন উপ-কমিটি। সদস্য বেগম নিহাদ কবিরও প্রথম দিকে বেশ কয়েকদিন এই উপ-কমিটিতে কাজ করেন। এই উপ-কমিটি প্রথম থেকে সময় সময় বসে এবং শেষের দুই সপ্তাহ সার্বক্ষণিক কাজ করে। এই শিক্ষানীতিকে ২৯টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে, প্রত্যেক অধ্যায়ে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং বাস্তবায়ন কৌশল উপস্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে প্রযোজ্য গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দিকনির্দেশনা ২৮নং অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে।

আজকের পৃথিবী দ্রুত পরিবর্তনশীল, তীব্র এর ছুটে চলার গতি, প্রবল প্রতিযোগিতাপূর্ণ এর যাবতীয় অর্থনৈতিক বিধি ব্যবস্থা ও কর্মকাণ্ড। অগ্রসরমান প্রক্রিয়া এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির, বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তির বৈপ্লবিক বিকাশ বিদ্যমান বিশ্বব্যবস্থাকে বাংলাদেশের মতো একটা উন্নয়নশীল দেশের জন্য আরো কঠিন চ্যালেঞ্জের ব্যাপার করে তুলছে। এহেন পৃথিবীতে 'যোগ্যতমের টিকে থাকা' কথাটা বিজ্ঞানীর কল্পনা নয়, অতি নির্মম, কঠিন, বাস্তব সত্য বটে। আর এই পৃথিবীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে কেবল টিকে থাকা বা কোনোমতে আত্মরক্ষাই নয়; বরং দৃঢ় পদক্ষেপ উন্নত শিরে এগিয়ে যেতে হলে শিক্ষা ও দক্ষতায় বলীয়ান, শক্ত মেরুদণ্ডের অধিকারী হতে হবে।

সেই শক্তি, সেই সামর্থ্য, সেই সংকল্প আসবে কোথা থেকে? বলা বাহুল্য, এ দেশের জনগণই হবে সেই শক্তির উৎস। এই জনগণই দেশের সকল সংগ্রামে, ত্যাগে, আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। দেশ গড়ার সংগ্রামে তাদেরকেই সক্ষম করে তুলতে হবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সকলের জন্য যথোপযুক্ত দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। কোটি কোটি লোকের জনবহুল এই দেশ। এই বিশাল জনগোষ্ঠির পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য, তার অমিত সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপদানে, যুগোপযোগী ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই।

দেশে দেশে উন্নত তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষ লক্ষ বেকার কিন্তু উদ্যোগী তরুণের সামনে উপার্জনের পথ খুলে দিয়েছে। এ দেশের তরুণদের জন্য শিক্ষা-প্রশিক্ষণের এবং তথ্য, প্রযুক্তি ও পুঁজির ব্যবস্থা জরুরী। এ দেশের তরুণ সমাজের একাংশ আর্থ-সামাজিক কারণে হতাশাচ্ছন্ন হয়ে বিপথগামী হচ্ছে, মাদকাসক্তি ও সন্ত্রাসের পথ ধরছে। তাদের জন্য একটি সুস্থ ও সম্ভাবনাময় পরিবেশ তৈরী করা জরুরী। বাংলাদেশের কর্মক্ষম সাধারণ মানুষের অনেকেই উপার্জনের আশায় বিদেশে যেতে চায়। এদের প্রয়োজন শিক্ষার এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চাহিদা রয়েছে এমন দক্ষতা অর্জনের। এই শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে এসবই বিবেচনা করা হয়েছে।

দারিদ্র্য ও বৈষম্য লাঘবে পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য টেকসই কর্মসংস্থানের বিকাশে তাদেরকে সক্ষম করে তোলাও জাতীয় শিক্ষানীতির একটি লক্ষ্য। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতিও এই লক্ষ্যে নির্ধারিত হয়েছিল। অন্তর্ভুক্তি ও দক্ষতা সৃষ্টির পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। দ্রুত নিরক্ষরতা দূর এবং সকলের জন্য মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করাও এই শিক্ষানীতির একটি মূল লক্ষ্য।

এখানে উল্লেখ্য যে, ২১ ফেব্রুয়ারীতে (১৯৫২ সাল) সূচিত হয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন বাঙালির সেই দিনের রক্তস্নাত বাংলাভাষা আন্দোলনের আলোকে ২১ ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে আজ বিশ্বে স্বীকৃত। ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক এই স্বীকৃতি দান বাঙালি জাতির জন্য অপরিসীম গৌরব বয়ে এনেছে। সঙ্গতভাবেই বাংলাদেশ বিশ্বের সকল মাতৃভাষার সমৃদ্ধি চায়। বাংলাদেশে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা এবং তৎসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও গবেষণার ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে স্থাপিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে কার্যকর ও সমৃদ্ধ করতে হবে।

দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে কোনো নীতিই চিরকালীন, স্থির, অবিচল ব্যাপার হয় না, হওয়া উচিত নয়। সময় ও অবস্থা বিবেচনায় অন্যান্য নীতির মতো শিক্ষানীতিতেও প্রয়োজনীয় রদবদলের সুযোগ থাকবে, পর্যালোচনার ব্যবস্থা নেয়া হবে সার্বিক, বৃহত্তর লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই। সচল, নিয়ত প্রবহমান, দেশ ও সমাজ তাতে আরো যুগোপযোগী হবে, আরো সমৃদ্ধ হবে, আরো উন্নত হবে।

সূচিপত্র

অধ্যায় - ১

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ১

অধ্যায় - ২

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা ৩

অধ্যায় - ৩

বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ১১

অধ্যায় - ৪

মাধ্যমিক শিক্ষা ১৪

অধ্যায় - ৫

বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা ১৭

অধ্যায় - ৬

মাদ্রাসা শিক্ষা ২০

অধ্যায় - ৭

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা ২২

অধ্যায় - ৮

উচ্চশিক্ষা ২৪

অধ্যায় - ৯

প্রকৌশল শিক্ষা ২৭

অধ্যায় - ১০

চিকিৎসা, সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা ২৯

অধ্যায় - ১১

বিজ্ঞান শিক্ষা ৩১

অধ্যায় - ১২

তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা ৩৩

অধ্যায় -১৩

ব্যবসায় শিক্ষা ৩৫

অধ্যায় - ১৪

কৃষি শিক্ষা ৩৭

অধ্যায় - ১৫

আইন শিক্ষা ৩৯

অধ্যায় - ১৬

নারী শিক্ষা ৪১

অধ্যায় - ১৭

ললিতকলা শিক্ষা ৪৩

অধ্যায় - ১৮

বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা, স্কাউট ও গার্লস গাইড এবং ব্রতচারী ৪৪

অধ্যায় - ১৯

ক্রীড়া শিক্ষা ৪৮

অধ্যায় - ২০
গ্রন্থাগার ৫০
অধ্যায় - ২১
পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ৫২
অধ্যায় - ২২
শিক্ষার্থীকল্যাণ ও নির্দেশনা ৫৫
অধ্যায় - ২৩
শিক্ষার্থী ভর্তি ৫৭
অধ্যায় - ২৪
শিক্ষক প্রশিক্ষণ ৫৮
অধ্যায় - ২৫
শিক্ষকদের মর্যাদা, অধিকার, দায়িত্ব ৬১
অধ্যায় - ২৬
শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক ৬৩
অধ্যায় - ২৭
শিক্ষা প্রশাসন ৬৫
অধ্যায় - ২৮
শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে বিশেষ কয়েকটি পদক্ষেপ ৭০
অধ্যায়-২৯
অর্থায়ন ৭২
সংযোজনী -১
বাংলাদেশের সংবিধানের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কতিপয় বিধান ৭৫
সংযোজনী -২
প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের জন্য প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রম কাঠামো ৭৬
সংযোজনী -৩
মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের বিষয় তালিকা (৯ম ও ১০ম শ্রেণী); ৭৭
মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের বিষয় তালিকা (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী)
সংযোজনী -৪
কারিগরি শিক্ষার পথ-নির্দেশিকা ৮৫
সংযোজনী -৫
সারণী-১ ঃ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ বাস্তবায়ন ঃ ২০০৯/১০-২০১৭/১৮ সময়ে প্রাক্কলিত অতিরিক্ত ব্যয় ৮৬
সারণী-২ ঃ শিক্ষা খাতের জন্য প্রাক্কলিত সম্ভাব্য বরাদ্দ, ২০০৯-২০১৮
সংযোজনী -৬
জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ২০০৯ ৮৯
সংযোজনী -৭ ৯০

১ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ প্রণয়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বিধৃত সংশ্লিষ্ট নির্দেশনাসমূহ (সংযোজনী-১) বিবেচনায় রাখা হয়েছে। জাতিসংঘ শিশু অধিকার কনভেনশন, যেখানে প্রত্যেক সদস্য দেশে সকল শিশুর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার তাগিদ রয়েছে, সেটিও বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়নে ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা। পাশাপাশি শিক্ষার মাধ্যমেই জাতিকে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এই শিক্ষানীতি সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশে সেক্যুলার গণমুখী, সুলভ, সুষম, সার্বজনীন, সুপরিকল্পিত এবং মানসম্পন্ন শিক্ষাদানে সক্ষম শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি ও রণকৌশল হিসেবে কাজ করবে। এই আলোকে শিক্ষার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও নীতিগত তাগিদ নিম্নরূপ :

১. শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের সচেতন করা।

২. ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।

৩. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা এবং তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ, এবং চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলীর (যেমনঃ ন্যায়বোধ, ধর্মনিরপেক্ষতা বোধ, কর্তব্যবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, শৃঙ্খলা, সহজীবন যাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি) বিকাশ ঘটানো।

৪. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা।

৫. দেশজ আবহ ও উপাদান সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর চিন্তা-চেতনা ও সৃজনশীলতার উজ্জীবন এবং তার জীবন-ঘনিষ্ট বিকাশে সহায়তা করা।

৬. দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে সৃজনধর্মী, প্রয়োগমুখী ও উৎপাদন সহায়ক করে তোলা; শিক্ষার্থীদেরকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশে সহায়তা প্রদান করা।

৭. জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে আর্থসামাজিক শ্রেণী-বৈষম্য ও নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করা, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, অসাম্প্রদায়িকতা, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।

৮. বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী স্থানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষা লাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা।

৯. গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে সহায়তা করা।

১০. মুখস্থ করা বিদ্যার পরিবর্তে বিকশিত চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং অনুসন্ধিৎসু মননের অধিকারী হয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতি স্তরের প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন নিশ্চিত করা।

১১. বিশ্ব পরিমন্ডলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিষয়ে উচ্চমানের দক্ষতা সৃষ্টি করা।

১২. জ্ঞানভিত্তিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর (ডিজিটাল) বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি (ICT) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য (গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজি) শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা।

১৩. শিক্ষাকে ব্যাপক ভিত্তিক করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উপর জোর দেওয়া, শ্রমের প্রতি শিক্ষার্থীদেরকে শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।

১৪. সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে সম-মৌলিক চিন্তাচেতনা গড়ে তোলা এবং জাতির জন্য সম-নাগরিক ভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে সব ধারার শিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যবই বাধ্যতামূলকভাবে পড়ানো। একই উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক স্তরেও একইভাবে কয়েকটি মৌলিক বিষয় পড়ানো।

১৫. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিশুর/শিক্ষার্থীর সুরক্ষা ও যথাযথ বিকাশের অনুকূল আনন্দময় ও সৃজনশীল পরিবেশ গড়ে তোলা এবং সেটি অব্যাহত রাখা।

১৬. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে শিক্ষার যথাযথ মান নিশ্চিত করা এবং পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত (শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ) জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত দৃঢ় করে পরবর্তী স্তরের সাথে সমন্বয় করা। এগুলো সম্প্রসারণে সহায়তা করা এবং নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সমর্থ করা। এই লক্ষ্যে শিক্ষা প্রক্রিয়ায়, বিশেষ করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথ অবদান রাখার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা। শিক্ষাকে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পণ্য হিসেবে ব্যবহার না করা।

১৭. শিক্ষার্থীদের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনসহ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ-সচেতনতা এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।

১৮. সর্বক্ষেত্রে মান-সম্পন্ন উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উৎসাহী করা এবং মৌলিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণার সাথে সাথে দেশের জন্যে প্রয়োজনীয় গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা।

১৯. উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা চর্চা এবং শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে সেই লক্ষ্যে যথাযথ আবহ ও পারিবার্শ্বিকতা নিশ্চিত করা।

২০. দেশের পশ্চাদপদ অঞ্চলগুলোতে শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২১. পথশিশুসহ আর্থ-সামাজিকভাবে বঞ্চিত সকল ছেলে-মেয়েকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা।

২২. দেশের আদিবাসিসহ সকল ক্ষুদ্রজাতিসত্তার সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ ঘটানো।

২৩. প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা।

২৪. দেশের জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা এবং সেই অর্জন ধরে রাখা।

২ প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা

ক. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

শিশুদের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু করার আগে প্রয়োজনীয় মানসিক ও দৈহিক প্রস্তুতি গ্রহণের পরিবেশ তৈরী করা প্রয়োজন। তাই তাদের জন্য বিদ্যালয়-প্রস্তুতিমূলক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা জরুরি। অন্যান্য শিশুর সঙ্গে একত্রে এই প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা শিশুর মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। কাজেই ৫+ বছর বয়স্ক শিশুদের জন্য এক বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করতে হবে। এই পর্যায়ে শিক্ষাক্রম হবেঃ

- শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের প্রতি শিশুর আগ্রহ সৃষ্টিমূলক এবং সুকুমার বৃত্তির অনুশীলন
- অন্যদের প্রতি সহনশীলতা এবং পরবর্তী আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য শৃঙ্খলাবোধ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া।

কৌশল

১. অন্যান্য গ্রহণযোগ্য উপায়ের সঙ্গে ছবি, রং, নানা ধরণের সহজ আকর্ষণীয় শিক্ষা উপকরণ, মডেল, হাতের কাজের সাথে সাথে ছড়া, গল্প, গান ও খেলার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্হা করা হবে।

২. শিশুদের স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা ও কৌতূহলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে তাদের স্বাভাবিক প্রাণশক্তি ও উচ্ছ্বাসকে ব্যবহার করে আনন্দময় পরিবেশে মমতা ও ভালোবাসার সাথে শিক্ষা প্রদান করা হবে। শিশুদের সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে যেন তারা কোনোভাবেই কোনোরকম শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের শিকার না হয়।

৩. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রতি বিদ্যালয়ে বাড়তি শিক্ষকের পদ সৃষ্টি ও শ্রেণীকক্ষ বৃদ্ধি করতে হবে। তবে সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল হওয়ায় এ কাজটি দেশের সকল বিদ্যালয়ে একই সঙ্গে বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হলে ধাপে ধাপে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. মসজিদ, মন্দির ও প্যাগোডায় ধর্ম মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত সকল ধর্মের শিশুদেরকে ধর্মীয়জ্ঞান, অক্ষরজ্ঞান সহ আধুনিক শিক্ষা ও নৈতিকতা শিক্ষা প্রদানের কর্মসূচি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অংশ হিসেবে গণ্য করা হবে।

খ. প্রাথমিক শিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অত্যধিক। দেশের সব মানুষের শিক্ষার আয়োজন এবং জনসংখ্যাকে দক্ষ করে তোলার ভিত্তিমূল প্রাথমিক শিক্ষা। তাই মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য জাতিসত্তা, আর্থ-সামাজিক, শারীরিক-মানসিক সীমাবদ্ধতা এবং ভৌগোলিক অবস্হান নির্বিশেষে দেশের সকল শিশুর জন্য সম-সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। এ কাজ করা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব। শিক্ষার এই স্তর পরবর্তী সকল স্তরের ভিত্তি সৃষ্টি করে বিধায় যথাযথ মানসম্পন্ন উপযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। প্রাথমিক শিক্ষার পর অনেকে কর্মজীবন আরম্ভ করে বলে মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা তাদের যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে। প্রাথমিক

শিক্ষাক্ষেত্রে স্থান ও বিদ্যালয় ভেদে সুযোগ-সুবিধার প্রকট বৈষম্য, অবকাঠামোগত সমস্যা, শিক্ষক-স্বল্পতা ও প্রশিক্ষণের দুর্বলতাসহ বিরাজমান সমস্যাসমূহ দূর করে জাতির সার্বিক শিক্ষার ভিত শক্ত করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা হবে সার্বজনীন, বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক, এবং সকলের জন্য একই মানের। অর্থনৈতিক, আঞ্চলিক এবং ভৌগোলিক কারণে বর্তমানে শতভাগ শিশুদের প্রাথমিক স্কুলের আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না, ২০১১-১২ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি ১০০ শতাংশে উন্নীত করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

- মানবিক বিকাশ এবং দেশজ আবহ ও উপাদানভিত্তিক পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং অনুসরণ করা। বিদ্যালয়ে আনন্দময় অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক সুরক্ষার ব্যবস্হা করা।
- কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী সব ধরণের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ানো বাধ্যতামূলক করা হবে (সংযোজনী ২-এ এই পর্যায়ের শিক্ষার বিস্তারিত শিক্ষাক্রম দেয়া হল)।
- শিশুর মনে ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচারবোধ, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবাধিকার, সহজীবন যাপনের মানসিকতা, কৌতূহল, প্রীতি, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি নৈতিক ও আত্মিক গুণাবলী অর্জনে সহায়তা করা এবং তাকে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমনস্ক করা এবং কুসংস্কারমুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে উৎসাহিত করা।
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দেশাত্মবোধের বিকাশ ও দেশগঠনমূলক কাজে তাকে উদ্বুদ্ধ করা।
- শিক্ষার্থীর যথাযথ মানসম্পন্ন নিজ স্তরের প্রান্তিক দক্ষতা নিশ্চিত করে তাকে উচ্চতর ধাপের শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী এবং উপযোগী করে তোলা। এই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা। এছাড়া ভৌত অবকাঠামো, সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা, শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক আকর্ষণীয়করণ এবং মেয়েদের মর্যাদা সমুন্নত রাখা।
- শিক্ষার্থীকে জীবনযাপনের জন্য আবশ্যকীয় জ্ঞান, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা, জীবন-দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, সামাজিক সচেতনতা অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণে সমর্থ করা এবং পরবর্তী স্তরের শিক্ষা লাভের উপযোগী করে গড়ে তোলার যথাযথ ব্যবস্হা গ্রহণ করা।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে কায়িক শ্রমের প্রতি আগ্রহ ও মর্যাদাবোধ এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণীতে প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
- প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্র জাতি সত্তার জন্য স্ব স্ব মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্হা করা।
- শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চাদপদ এলাকাসমূহে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ নজর দেয়া।
- প্রতিবন্ধীসহ সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত ছেলেমেয়েদের জন্য সযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে সকল শিক্ষার্থীর জন্য সম-সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- বিভিন্ন ধরনের (কমিউনিটি বিদ্যালয়, রেজিস্ট্রিকৃত নয় এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রেজিস্ট্রিকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রামীণ ও শহুরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে সুযোগ-সুবিধার যে প্রকট বৈষম্য বিরাজমান তা দূরীকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেয়া। সাধারণ ও মাদরাসাসহ (আলিয়া ও কওমী) সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশন করা।

কৌশল

রাষ্ট্রের দায়িত্ব

সকলের জন্য মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করার তাগিদ সংবিধানে বিধৃত আছে। তাই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্হাপনা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং রাষ্ট্রকেই এই দায়িত্ব পালন করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জাতীয়করণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব বেসরকারী বা এনজিও খাতে হস্তান্তর করা যাবে না। কোনো ব্যক্তি বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা কোনো এনজিও প্রাথমিক শিক্ষাদানকল্পে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাতে চাইলে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান পালন করে করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ

১. প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ৫ বছর থেকে বৃদ্ধি করে ৮ বছর অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করা হবে। এটি বাস্তবায়নে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অবকাঠামোগত এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা।

২০১১-১২ অর্থ বছর থেকে প্রাথমিক শিক্ষায় ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত চালু করার জন্য অনতিবিলম্বে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে:

- প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার নতুন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা;
- প্রাথমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষকের জন্য শিক্ষাক্রম বিস্তারসহ শিখন-শেখানো কার্যক্রমের ওপর ফলপ্রসূ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস করা।

প্রাথমিক শিক্ষার এই পুনর্বিন্যাসের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ের সকল বিদ্যালয়ের ভৌত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং শিক্ষকের সংখ্যা বাড়াতে হবে। যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে আট বছরব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ২০১৮-এর মধ্যে ছেলে-মেয়ে, আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং জাতিসত্তা নির্বিশেষে পর্যায়ক্রমে বিভাগওয়ারী সারা দেশের সকল শিশুর জন্য নিশ্চিত করা হবে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পর্যায়ক্রম বিবেচনায় রেখে অর্থ যোগানের দিকে নজর দেয়া হবে।

বিভিন্ন ধারার সমন্বয়

২. একই পদ্ধতির মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার বাংলাদেশের সংবিধানে ব্যক্ত করা হয়েছে। সাংবিধানিক তাগিদে বৈষম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে সমগ্র দেশে প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত বিষয়সমূহে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রবর্তন করা হবে। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন ধারা যথা সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিণ্ডারগার্টেন, ইবতেদায়ি মাদরাসা ও বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়/শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে সমন্বয় ঘটানোর জন্য এই ব্যবস্হা চালু করা হবে। নির্ধারিত বিষয়সমূহ ছাড়া অন্যান্য নিজস্ব কিংবা অতিরিক্ত বিষয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা অধিদপ্তরের অনুমতি সাপেক্ষে বিভিন্ন ধারায় সন্নিবেশ করা যাবে।

৩. শিক্ষার মান ও শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ইবতেদায়ি ও কওমী মাদ্রাসাসমূহ আট বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা চালু করবে এবং প্রাথমিক স্তরের নতুন সমন্বিত শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবে।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবস্তু

৪. প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার ধারা (সাধারণ, মাদরাসা) নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট শ্রেণীর পাঠ্যসূচি অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয়সমূহ অর্থাৎ বাংলা, ইংরেজি, নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ স্টাডিজ, গণিত, সামাজিক পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণাসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতি এবং তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হবে। সর্বত্র অবকাঠামো তৈরি এবং কম্পিউটার সরবরাহ ও কম্পিউটার শিক্ষক নিয়োগ না দেয়া পর্যন্ত তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা ও মূল্যায়ন, তথ্যপ্রযুক্তি-সহজপাঠ ও অনুশীলন-পুস্তকভিত্তিক হবে। মানসম্পন্ন ইংরেজি লিখন-কথনের লক্ষ্যে যথাযথ কার্যক্রম শুরু থেকেই গ্রহণ করা হবে এবং ক্রমান্বয়ে ওপরের শ্রেণীসমূহে প্রয়োজনানুসারে জোরদার করা হবে। প্রথম শ্রেণী থেকে সহশিক্ষাক্রমিক বিষয় থাকতে পারে; তৃতীয় শ্রেণী থেকে মূলত জীবনী ও গল্পভিত্তিক বিভিন্ন ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে এবং শেষ তিন শ্রেণীতে অর্থাৎ ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জীবন পরিবেশের উপযোগী প্রাক-বৃত্তিমূলক এবং তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা প্রদান করা হবে, যাতে যারা কোনো কারণে আর উচ্চতর পর্যায়ে পড়বে না এ শিক্ষার ফলে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে পারে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি লাইব্রেরি স্থাপন করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের উপযোগী বই দিয়ে তা সমৃদ্ধ করতে হবে।

ভর্তির বয়স

৫. বর্তমানে চালু ৬+ বছরে বয়সে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির নিয়ম বাধ্যতামূলক করা হবে। এর সঠিক বাস্তবায়নের জন্য জন্ম (এবং মৃত্যু) নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক করা আবশ্যক।

৬. প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১ ঃ ৩০। এ লক্ষ্য পর্যায়ক্রমে পাঁচ বছরে অর্জন করতে হবে।

বিদ্যালয়ের পরিবেশ

৭. সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষা দান ও গ্রহণ এবং শিক্ষার্থীর সুরক্ষার অনুকূল পরিবেশ জরুরি।

শিক্ষা-সামগ্রী

৮. প্রাথমিক শিক্ষার নির্ধারিত উদ্দেশ্যাবলীর ভিত্তিতে শিক্ষাক্রম-কাঠামো অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য পৃথক বিষয়-ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা এবং শ্রেণীগত যোগ্যতা নির্ধারণ করে বিষয় ভিত্তিক শিক্ষা সামগ্রী যথা পাঠ্যপুস্তক এবং প্রয়োজনবোধে সম্পূরক পঠন সামগ্রী এবং অনুশীলন পুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা (বিশ্লেষণ, উদাহরণ ও এক্সারসাইজ সংবলিত পুস্তক) প্রণয়ন করবে। সকল পাঠ্যপুস্তক সহজ, সাবলীল ভাষায় রচিত, আকর্ষণীয় এবং নির্ভুল হতে হবে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ব্রেইল পদ্ধতিতে পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঝরে পড়া সমস্যার সমাধান

৯. দরিদ্র ছেলেমেয়েদের জন্য উপবৃত্তি সম্প্রসারণ করতে হবে।

১০. স্কুলের পরিবেশ আকর্ষণীয় ও আনন্দময় করে তুলতে হবে। এই লক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের মানসম্পন্ন ভিন্ন টয়লেট, খেলাধুলার সুব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকদের আগ্রহ, মমত্ববোধ ও সহানুভূতিশীল আচরণ এবং পরিচ্ছন্ন ভৌত পরিবেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপকরণ। শারীরিক শাস্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা হবে।

১১. দুপুরের খাবার ব্যবস্থা করা জরুরি। পিছিয়ে পড়া এলাকাসহ গ্রামীণ সকল বিদ্যালয়ে দুপুরে খাবার ব্যবস্হা পর্যায়ক্রমে চালু করতে হবে।

১২. পাহাড়ি এলাকায় এবং দূরবর্তী ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের জন্য বিদ্যালয়ে হোস্টেলের ব্যবস্থা করার দিকে নজর দিতে হবে।

১৩. হাওর এবং একসঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার হয় এমন এলাকাসমূহের বিদ্যালয়ে সময়সূচী এবং ছুটির দিনসমূহের পরিবর্তন করার সুযোগ থাকবে। এ সকল বিষয়ে স্থানীয় সমাজভিত্তিক তদারকি ব্যবস্থার সুপারিশে স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে।

১৪. মেয়ে শিশুদের মধ্যে ঝরে পড়ার প্রবণতা তুলনামূলকভাবে অধিক, তাই এই সকল শিশু যাতে ঝরে না পড়ে সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। মেয়ে শিক্ষার্থীরা যেন বিদ্যালয়ে কোনোভাবে উত্যক্ত না হয় সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

১৫. বর্তমানে ৫ম শ্রেণী শেষ করার আগে প্রায় অর্ধেক এবং যারা পরবর্তী পর্যায়ে যায় তাদের প্রায় ৪০ শতাংশ দশম শ্রেণী শেষ করার আগে ঝরে পড়ে। ঝরে পড়া দ্রুত কমিয়ে আনা জরুরী। ২০১৮ সালের মধ্যে সকল শিক্ষার্থী যেন ৮ম শ্রেণী শেষ করে সেই লক্ষ্যে উপর্যুক্ত পদক্ষেপগুলোসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা দ্রুত গ্রহণ করতে হবে।

আদিবাসি শিশু

১৬. আদিবাসি শিশুরা যাতে তাদের নিজেদের ভাষা শিখতে পারে সেই লক্ষ্যে আদিবাসি শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্হা করতে হবে। এই কাজে, বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তক তৈরিতে, আদিবাসি সমাজের সম্পৃক্ততা জরুরি।

১৭. আদিবাসি প্রান্তিক শিশুদের জন্য বিশেষ সহায়তার ব্যবস্হা করতে হবে।

১৮. যে সকল আদিবাসি অধ্যুষিত (পাহাড় কিংবা সমতল) এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেসকল এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্হাপন করতে হবে। যেহেতু কোনো কোনো এলাকায় তাদের বসতি হালকা তাই একটি বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে আবাসিক ব্যবস্হার প্রয়োজন হলে সেদিকেও নজর দিতে হবে।

প্রতিবন্ধী শিশু

১৯. বিদ্যালয়গুলোতে প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রয়োজনানুসারে শৌচাগার ব্যবহার ও চলাফেরার সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

২০. তাদের প্রয়োজনের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

পথশিশু ও অন্যান্য অতিবঞ্চিত শিশু

২১. এদেরকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনার এবং ধরে রাখার লক্ষ্যে বিনা খরচে ভর্তির সুযোগ, বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, দুপুরের খাবার ব্যবস্হা এবং বৃত্তিদানসহ বিশেষ ব্যবস্হা গ্রহণ করতে হবে। বিদ্যালয়ে তাদের সুরক্ষার দিকে প্রয়োজনে কার্যকর ব্যবস্হা গ্রহণ করা হবে।

বিভিন্ন ধরনের এবং এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে বিদ্যমান প্রকট বৈষম্য

২২. এই বৈষম্য ধাপে ধাপে কমিয়ে আনতে হবে। সেই লক্ষ্যে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া এলাকাসমূহে অবস্থিত স্কুলসহ গ্রামীণ বিদ্যালয়সমূহকে বিশেষ সহায়তা দিতে হবে, পরিকল্পিত কর্মসূচীর ভিত্তিতে, যাতে কয়েক বছরের মধ্যে বৈষম্য নিরসনে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে।

শিক্ষণ পদ্ধতি

২৩. শিশুর সৃজনশীল চিন্তা ও দক্ষতার প্রসারের জন্য সক্রিয় শিক্ষণ-পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষার্থীকে এককভাবে বা দলভিত্তিক কার্য সম্পাদনের সুযোগ দেওয়া হবে। ফলপ্রসূ শিক্ষাদান পদ্ধতি উদ্ভাবন, পরীক্ষণ ও বাস্তবায়নের জন্য গবেষণাকে উৎসাহিত করা হবে এবং সহায়তা দেওয়া হবে।

শিক্ষার্থী মূল্যায়ন

২৪. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং তৃতীয় থেকে সকল শ্রেণীতে অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষা চালু থাকবে। পঞ্চম শ্রেণী শেষে সকলের জন্য উপজেলা/পৌরসভা/থানা (বড় বড় শহর) পর্যায়ে স্থানীয় সমাজ-কমিটি ও স্থানীয় সরকারের যৌথ ব্যবস্থাপনায় সমাপনী পরীক্ষা এবং অষ্টম শ্রেণী শেষে বিভাগভিত্তিক পাবলিক পরীক্ষা হবে। এই পরীক্ষাটি প্রাথমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা নামে পরিচিত হবে। সকল পরীক্ষায় মুখস্তকে নিরুৎসাহিত করা এবং সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা হবে। পঞ্চম শ্রেণী শেষে সংশ্লিষ্ট এলাকা-ভিত্তিক পরীক্ষার ফলাফলের নিরিখে এলাকা-ভিত্তিক অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান করা হবে। অষ্টম শ্রেণী শেষে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল অনুসারে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিভাগ-ভিত্তিক বৃত্তি প্রদান করা হবে।

বিদ্যালয়ের উন্নতি ও শিক্ষার মানন্নোয়নে তদারকি এবং তাতে জনসম্পৃক্ততা

২৫. বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ বিবেচনার ভিত্তিতে ব্যাবস্থাপনা কমিটিকে আরো সক্রিয় করার লক্ষ্যে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কমিটিকে প্রয়োজনে আরো ক্ষমতা দেয়া যেতে পারে। তবে পাশাপাশি কমিটির জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

২৬. সক্রিয় অভিভাবক-শিক্ষক কমিটি প্রতিষ্ঠা করে অভিভাবকদেরকে বিদ্যালয় ও তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার বিষয়ে আরো উৎসাহী করার পদক্ষেপ নেয়া হবে।

২৭. এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন ও তা সর্বগ্রাহ্যভাবে যাচাইয়ের লক্ষ্যে শিক্ষক, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় সরকারের উদ্যোগে অভিন্ন প্রশ্নপত্র ও যথোপযুক্ত ইনভিজিলেশন সাপেক্ষে পঞ্চম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা এবং অষ্টম শ্রেণীর প্রাক-পাবলিক পরীক্ষা, আর যতদিন পর্যন্ত এসএসসি পরীক্ষা থাকবে ততদিন পর্যাপ্ত টেষ্ট পরীক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য উৎসাহ দেয়া হবে ও সহায়তা করা হবে। এছাড়া, এই কমিটির পক্ষ থেকে বিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে শিক্ষার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোনো বিদ্যালয়ে কোনো সমস্যা থাকলে তা সমাধানে সহায়তা করবে। ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে স্থানীয় উৎসাহ উদ্দীপনা ও দায়-দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার গতিশীল হবে। স্থানীয় উদ্যোগই হবে এই কাজের মূল চালিকা শক্তি। শিক্ষার মানোন্নয়ন ফাউন্ডেশন বা অন্য কোন উপযুক্ত নামে প্রাথমিকভাবে ২০-২৫ লাখ টাকার একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করলে এর আয় থেকে এই কার্যক্রমের খরচ সংকুলান হতে পারে। আর এই তহবিলের অর্থ মূলত স্থানীয় বিত্তবানদের দান থেকে সংগৃহীত হতে পারে। সরকারও এই তহবিলে অনুদান দিতে পারে।

শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষকদের পদোন্নতি

২৮. প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষক নিয়োগের সর্বনিম্ন সাধারণ যোগ্যতা হবে দ্বিতীয় বিভাগসহ এইচইসসি/মাধ্যমিক পাশ এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর জন্য দ্বিতীয় বিভাগসহ স্নাতক ডিগ্রিধারী মহিলা বা পুরুষ। তবে নিচের শ্রেণীতে মহিলা শিক্ষকদের প্রধান্য দেয়া হবে। পরবর্তী সময়ে এ সকল শিক্ষককে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে এবং সি এন এড/বি.এড অর্জন করতে হবে। প্রধান শিক্ষকের সরাসরি নিয়োগের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা হবে দ্বিতীয় বিভাগে স্নাতক; এবং তিন বছরের মধ্যে সিএনএড বা বি.এড (প্রাইমারি) ডিগ্রি অর্জন করতে হবে। শিক্ষকদের স্তর এবং বেতন স্কেল বস্তুনিষ্ঠভাবে বিন্যাস করে (যথা- সহকারী শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক) তাদের পদন্নোতির সুযোগ সৃষ্টি করে শিক্ষকদের উৎসাহিত করা হবে। অর্থনৈতিক বাস্তবতা এবং জাতির ভবিষ্যৎ গঠনে শিক্ষকদের গুরুত্ব ও মর্যাদা বিবেচনায় নিয়ে তাদের বেতন-ভাতা নির্ধারণ করা হবে; পাশাপাশি তাদের জবাবদিহিতাও নিশ্চিত করতে হবে।

২৯. শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বিভিন্ন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং কর্মকালীন প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। প্রয়োজনবোধে ও সম্ভাব্যক্ষেত্রে বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ ক্ষমতা বাড়াতে হবে। উপযুক্ত প্রশিক্ষক ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ সামগ্রীসহ একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি যেন এই প্রতিষ্ঠানগুলো পেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩০. শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সঙ্গে পদোন্নতির যোগসূত্র স্থাপন করা আবশ্যক। উচ্চতর ডিগ্রিধারী এবং প্রশিক্ষিত যোগ্যতাসম্পন্নদের সরাসরি নিয়োগ এবং ত্বরান্বিত পদোন্নতির মাধ্যমে উচ্চতর পদ পূরণের ব্যবস্থা করা হবে। প্রয়োজনে পদ উন্নীত (আপগ্রেইডিং) করা যেতে পারে। তবে এর জন্য যথাযথ বিধি-বিধান তৈরি করতে হবে।

শিক্ষক নির্বাচন

৩১. সরকারি অনুমোদন ও সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ইবতেদায়ী মাদরাসার জন্য মেধাভিত্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচনের লক্ষ্যে সরকারি কর্মকমিশনের অনুরূপ একটি পৃথক **বেসরকারী শিক্ষক নির্বাচন ও উন্নয়ন কমিশন** গঠন করা হবে। এই কমিশন শিক্ষা ও প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হবে। যথাযথ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে কমিশন শিক্ষক নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পাদন করবে। এই নির্বাচন উপজেলা বা জেলা ভিত্তিক হতে পারে। কমিশন দ্বারা নির্বাচিতদের মধ্য থেকে যথাযথ নিয়োগদানকারী কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ দিবে। বিদ্যালয়গুলি প্রত্যেক বছর তাদের কোন বিষয়ে কতজন শিক্ষক প্রয়োজন তা উপজেলা ভিত্তিক সমন্বয় করে কমিশনকে জানাবে- আর এই ভিত্তিতে একটি বছরে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নির্বাচনের থানা ভিত্তিক লক্ষ্য স্থির করা হবে। এই কমিশনকে মাধ্যমিক ও বেসরকারী (সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত) ডিগ্রী কলেজের শিক্ষক নির্বাচনের দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। *

বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ

৩২. বিদ্যালয়ে আভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব মূলত প্রধান শিক্ষকের ওপর; তাই এই দায়িত্ব দক্ষতার সাথে যাতে প্রধান শিক্ষকগণ পালন করতে পারেন সেইজন্য তাদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের বহিঃ তত্ত্বাবধানের ও পরিবীক্ষণের কাজ যথাসম্ভব বিকেন্দ্রীকরণ করা আবশ্যক। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে স্থানীয় সরকারকে সংশ্লিষ্ট করা বাঞ্ছনীয়। এই কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাদেরকে (যেমন- এটিপিও) বাস্তবসম্মতভাবে বিদ্যালয়ের সংখ্যা নির্ধারণ করে দিতে হবে যাতে তারা তত্ত্বাবধায়ন ও পরিবীক্ষণ কাজ প্রত্যেক বিদ্যালয়ে যথেষ্ট সময় সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারেন। স্হানীয় জন-নজরদারি ব্যবস্হার (কৌশল ১৮) সঙ্গে এই কর্মকর্তা তার কাজ সমন্বয় করবেন।

৩৩. প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীন বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে। কোন গ্রামে বিদ্যালয় নেই বা কোন গ্রামে আরো বিদ্যালয় প্রয়োজন তা জরিপের মাধ্যমে নির্বাচন করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বেসরকারী বিদ্যালয় স্থাপনকে উৎসাহিত করা হবে। তবে সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে সকল বিদ্যালয়ে যেন উন্নত সম-মানের শিক্ষাদান করা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

অন্যান্য

৩৪. ন্যাশনাল একাডেমী ফর প্রাইমারি এডুকেশন (নেপ)-কে অভীষ্ট মানের শীর্ষ পর্যায়ের জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে যেন তা প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে বিভিন্ন উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রম কার্যকরভাবে সম্পন্ন করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ পিটিআইগুলোর অ্যাকাডেমিক স্টাফদের এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও প্রজেক্টভুক্ত অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, মৌলিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম তৈরী ও অনুমোদন, প্রশিক্ষণ তত্ত্বাবধান, প্রশিক্ষণার্থীদের পরীক্ষা পরিচালনা ও ডিপ্লোমা প্রদান করা, প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা, কর্মশালা, সম্মেলন পরিচালনা ইত্যাদি।

৩৫. প্রত্যেক পিটিআইতে বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাদান পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্হা করা জরুরী।

৩৬. সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমগ্র জাতিকে সর্বশক্তি নিয়োজিত করতে হবে।

৩ বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার লক্ষ্য হচেছ ২০১৪ সালের মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নাগরিককে সাক্ষর করে তোলা। বিশাল নিরক্ষর জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বর্তমানে পনের বছরের বেশি বয়সীদের সাক্ষরতার হার শতকরা ৪৯, অর্থাৎ পনের বছরের বেশি বয়সীদের শতকরা ৫১ ভাগ এখনও নিরক্ষর। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অপ্রতুলতা ও অনমনীয়তা এবং অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও দারিদ্র্যের কারণে দেশে বিরাজমান নিরক্ষরতা ব্যাপক। নানা কারণে অনেক ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় না বা ভর্তি হয়েও পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারে না। নিরক্ষরতা সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীর বয়স ও শিক্ষা-বিষয়কে ভিত্তি করে বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে কার্যকর গণশিক্ষার বিস্তার তাই জরুরী।

বয়স্ক শিক্ষা

বয়স্ক শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে সাক্ষর, লেখা-পড়া ও হিসাব-নিকাশে ন্যূনতমভাবে দক্ষ, মানবিক গুণাবলির চেতনায় উদ্দীপ্ত, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতন করে তোলা এবং পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন। প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তি ১০০ শতাংশে উন্নীত এবং প্রাপ্ত বয়স্ক সকলকে সাক্ষর করে না তোলা পর্যন্ত বয়স্ক শিক্ষার এই ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করা হবে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার পরিপূরক ব্যবস্থা। প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তি ১০০ শতাংশে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত যে সকল শিশু-কিশোর বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না এবং যারা ঝরে পড়ে যায় তারা মৌলিক শিক্ষা লাভ করবে এবং কিছু ব্যবহারিক শিক্ষাও পাবে যা তারা প্রয়োজনে বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপনকারী শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় উপযুক্ত শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে।

কৌশল

বয়স্ক শিক্ষা

১. বয়স্ক শিক্ষার আওতায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে সাক্ষরতা শিক্ষা, মানবিক গুণাবলীর বিকাশ, সচেতনতা অর্জন ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন।

২. দেশের সকল নিরক্ষর নারী-পুরুষের জন্য এই শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে নিরক্ষরদের মধ্যে যাদের বয়স ১৫ থেকে ৪৫ বছর তারা অগ্রাধিকার পাবে।

৩. বয়স্ক শিক্ষার জন্য শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। বয়স্ক সাক্ষরতা কোর্স ভিন্ন অন্যান্য কোর্সের সময়সীমা, বিষয়বস্তু, পঠন-পাঠনের পদ্ধতি, শিক্ষকের যোগ্যতা ও শিক্ষণ-প্রক্রিয়া, স্থানীয় ও প্রবাসী জনমানুষের চাহিদা, সম্পদের প্রাপ্যতা ও পেশাগোষ্ঠীর প্রকৃতি অনুসারে নির্ধারিত হবে। জাতীয় গণশিক্ষার শিক্ষাক্রম-বিষয়ক কমিটি প্রয়োজনে শিক্ষার অন্যান্য ধারার যেমন- বৃত্তিমূলক ও কারিগরি, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ, কৃষি, বন ও পরিবেশ, মৎস্য ও পশুপালন ইত্যাদির সঙ্গে সমন্বয় রেখে এবং বিদেশে দক্ষ শ্রমিক প্রেরণের বিষয়টি বিবেচনা করে উপযুক্ত বিষয়াদির শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হবে।

৪. অর্জিত শিক্ষা ও দক্ষতাকে অটুট রাখার জন্য অব্যাহত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। গ্রামে পাঠ-অনুশীলন-চক্র ও গ্রামশিক্ষা-মিলনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা বাঞ্ছনীয়।

৫. সমন্বিত সাক্ষরতা অভিযানে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সমাজ বিভিন্ন পদ্ধতি, উপকরণ, প্রক্রিয়া ও অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সমন্বয় ঘটিয়ে যথাসম্ভব কম সময়ে দেশ থেকে নিরক্ষতা দূর করার চেষ্টা করা হবে। এই ধরণের বাস্তব উদ্যোগ উৎসাহিত করা হবে এবং মূল্যায়ন সাপেক্ষে যে উদ্যোগ বিশেষভাবে কার্যকর প্রতীয়মান হবে সেটিকে জোরদার করার লক্ষ্যে সহায়তা দেয়া হবে। এই লক্ষ্যে শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা বাঞ্চনীয়। এই কাজে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে পরবর্তীতে (১২নং কৌশলে) প্রস্তাবিত বাংলাদেশ অব্যাহত ও দক্ষতা শিক্ষা সংস্হা এবং তা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো।

৬. স্হানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ, বিশেষ করে ছুটির সময় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পৃক্ত করে সংক্ষিপ্ত ও কার্যকর শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে বয়স্ক শিক্ষার কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্হা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে দেশে বিভিন্ন মহল কর্তৃক পরিচালিত/উদ্ভাবিত বয়স্ক শিক্ষাদান পদ্ধতি বিবেচনায় নিয়ে দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

৭. সাক্ষরতা কর্মসূচি পরিচালনায় বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে দূরশিক্ষণ পদ্ধতিও ব্যবহার করা যেতে পারে।

উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা

৮. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় ভর্তি হওয়ার বয়স আট বছর থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।

৯. প্রাথমিক শিক্ষার জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার উপকরণ প্রণীত হবে। উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার উপকরণে জাতীয় চাহিদার প্রতিফলন থাকবে। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা যায় এমন উপকরণ দ্বারাই উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালিত হবে। গণশিক্ষার শিক্ষাক্রম বিষয়ক একটি টেক্‌নিক্যাল কমিটি বিভিন্ন উপকরণ পর্যালোচনা করে মানসম্মত উপকরণাদির অনুমোদন দেবে।

১০. বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রাথমিক শিক্ষার জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য উৎসাহিত করা হবে। দেশের অনগ্রসর এলাকা এবং অতিবঞ্চিত শিশুদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই শিক্ষাক্রমের আওতায় আনার চেষ্টা করা হবে।

১১. উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পাঠদানে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করা হবে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কর্মোদ্যোগের সমন্বয়

১২. গণশিক্ষার ক্ষেত্রে সকল কর্মোদ্যোগের সমন্বয় করা হবে। এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোকে **'বাংলাদেশ অব্যাহত ও দক্ষতা শিক্ষা সংস্থায়'** রূপান্তরিত করা হবে। এই সংস্থা সরকারী গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার মূল দায়িত্বে থাকবে এবং অর্থায়নের ব্যবস্থা করবে। বেসরকারী গণশিক্ষা কর্মোদ্যোগও এই সংস্থা সমন্বয় করবে।

১৩. গণশিক্ষা প্রসারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং জাতীয় গণমাধ্যমের ভূমিকা সমন্বিত করা হবে।

গণশিক্ষা সংক্রান্ত আইন

১৪. বয়স্কশিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রসারের জন্য যে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে তা পূরণ করার জন্য প্রয়োজনে যথাযথ আইনগত কাঠামো প্রবর্তন করা হবে।

৪ মাধ্যমিক শিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

বর্তমানের ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর পরিবর্তে নতুন শিক্ষা কাঠামোয় নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর হিসেবে বিবেচিত হবে। এই স্তরের শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা সামর্থ্য অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষায় বিভিন্ন ধারায় যাবে, নয়তো অর্জিত বৃত্তিমূলক শিক্ষার ভিত্তিতে বা আরো বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে জীবিকার্জনের পথে যাবে। মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে তিনটি ধারা থাকবে- সাধারণ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষা ধারা, এবং প্রত্যেক ধারা কয়েকটি শাখায় বিভক্ত থাকবে । সব ধারাতেই জন-সমতাভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে যথা ঃ বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ স্টাডিজ ও সাধারণ গণিতের (তথ্যপ্রযুক্তিসহ অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষাক্রম সংযোজনী ৩-এ দেখানো হয়েছে) শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী বাধ্যতামূলক থাকবে। অবশ্য প্রত্যেক ধারায় ধারা-সংশ্লিষ্ট আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক বিভিন্ন বিষয় থাকবে। মাদরাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে ইবতেদায়ী শেষ করে যে কোন ধারায় নবম শ্রেণীতে এবং আলিম পর্যায় শেষ করে যথাযথ বাছাই সাপেক্ষে ডিগ্রি পর্যায়ে ভর্তি হওয়া যাবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

- শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা।
- কর্মজগতে অংশগ্রহণের জন্য, বিশেষ করে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, একটি পর্যায়ের প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে শিক্ষার্থীকে তৈরি করা।
- মানসম্পন্ন শিক্ষাদান করে প্রাথমিক স্তরে প্রাপ্ত মৌলিক জ্ঞান সম্প্রসারিত ও সুসংহত করা। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসম্পন্ন উচ্চ শিক্ষার ভিত শক্ত হবে।
- বিভিন্ন রকমের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো হবে। পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোর জন্যও যতদিন প্রয়োজন বিশেষ পদক্ষেপের মাধ্যমে শিক্ষার অগ্রগতি সমর্থন করা হবে।
- উল্লেখিত নির্ধারিত বিষয়ে সকল ধারায় অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা এবং অব্যাহত রাখা হবে।

কৌশল

শিক্ষার মাধ্যম

১. শিক্ষার মাধ্যম এই পর্যায়ে মূলত বাংলা হবে তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী ইংরেজি মাধ্যমেও শিক্ষা দেয়া যাবে। বিদেশীদের জন্য সহজ বাংলা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক

২. মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের তিনটি ধারায়, অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষা, মাদরাসা শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ধারায় নির্ধারিত বাংলা, ইংরেজী, গণিত, তথ্য প্রযুক্তি ও বাংলাদেশ স্টাডিজ শিক্ষায় অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী এবং সাধারণ আবশ্যিক বিষয়সমূহে অভিন্ন পাঠ্যসূচী অনুসরণ করতে হবে। প্রত্যেক ধারায় এসকল বিষয়ে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

৩. ধারাসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ধারার শিক্ষার উৎকর্ষতা অর্জনের প্রয়োজন-ভিত্তিক বিন্যাস এবং সেই অনুসারে স্ব স্ব শিক্ষাক্রম তৈরি করতে হবে।

৪. মাধ্যমিক স্তরে সকল ধারার জন্য অভিন্ন শিক্ষাক্রম এবং মাদরাসা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিশেষ বিষয়সমূহ ছাড়া সকল শিক্ষাক্রম এবং প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। মাদরাসা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিশেষ বিষয়সমূহের পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব থাকবে যথাক্রমে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের উপর।

অবকাঠামো এবং শিক্ষক ও স্টাফ

৫. বর্তমান উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী সংযোজন করতে হবে এবং উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলোতে নবম ও দশম শ্রেণী খোলার ব্যবস্থা করতে হবে। এই লক্ষ্যে বিদ্যালয়গুলোতে শ্রেণী কক্ষ ও বিভিন্ন আসবাবপত্র ও শিক্ষা সরঞ্জাম বৃদ্ধি করতে হবে। উচ্চবিদ্যালয়গুলোতে উচ্চতর শ্রেণীসমূহ পড়ানোর জন্য ইংরেজিসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। পদক্ষেপগুলির বাস্তবায়নে অর্থের যোগানের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

৬. সুষ্ঠ পাঠদানের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সার্বিক অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। খেলাধুলার সরঞ্জাম ও সমৃদ্ধ গ্রন্থগারের ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রন্থাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য গ্রন্থগারিক পদ সৃষ্টি করে এই পদে নিয়োগ দিতে হবে।

৭. বিজ্ঞান শিক্ষাদানকারী প্রত্যেক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি সংবলিত ল্যাবরেটারি থাকতে হবে এবং এর যথাযথ রক্ষণা-বেক্ষণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

সুযোগবঞ্চিত শিক্ষার্থী ও অনগ্রসর অঞ্চল

৮. বিভিন্ন কারণে সংকুচিত সুযোগপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য অগ্রসর শিক্ষার্থীদের অনুরূপ সম-সুযোগ সৃষ্টি এবং বিভিন্ন রকমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এবং অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত পদক্ষেপ সমূহের অনুরূপ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দক্ষতা

৯. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে অধিক সম্পর্কিত সামাজিক বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার বিষয়সমূহ (যেমন- অর্থনীতি, হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা), কারিগরি শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি কম্পিউটার এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়গুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতেও দ্রুত সরকারী সহায়তা (যেমন শিক্ষকের বেতন-ভাতা, বিজ্ঞান শিক্ষার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ইত্যাদি) প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত

১০. শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত পর্যায়ক্রমে ৬-৭ বছরের মধ্যে ১:৩০ উন্নীত করতে হবে।

শিক্ষক নিয়োগ

১১. সরকারী কর্মকমিশনের অনুরূপ প্রস্তাবিত **বেসরকারী শিক্ষক নির্বাচন ও উন্নয়ন** কমিশন যথাযথ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক প্রতি বছর নির্বাচন করবে এবং এদের মধ্য থেকে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ করবে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

১২. সকল বিষয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকগণকে অনতিবিলম্বে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্য কাজে যোগদানের আগে মৌলিক শিক্ষকতা-প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। শূন্য পদ পূরণের সময় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

শিক্ষার্থী মূল্যায়ন

১৩. দশম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা আঞ্চলিক পর্যায়ে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে এবং এই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান করা হবে (বিস্তারিত অধ্যায় ২১)। দ্বাদশ শ্রেণী শেষে একটি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং এর নাম হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষা হবে সৃজনশীল পদ্ধতিতে এবং পরীক্ষার মূল্যায়ন হবে গ্রেডিং পদ্ধতিতে। ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ

১৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়মিত ও কার্যকর পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে প্রশাসনিকভাবে এবং প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্ণিত ব্যবস্থায় স্থানীয় জন-সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে।

অন্যান্য

১৫. 'ও' লেভেল এবং 'এ' লেভেল শিক্ষাব্যবস্হার পাঠক্রম, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন যেহেতু একটি বিদেশী ধারায় হয় সেহেতু 'ও' এবং 'এ' লেভেলকে বিশেষ ব্যবস্হা হিসেবে গণ্য করা হবে। সরকারী অনুমোদন সাপেক্ষে এই শিক্ষা পরিচালিত হবে এবং 'ও' লেভেলকে দশম শ্রেণী এবং 'এ' লেভেলকে দ্বাদশ শ্রেণীর সমকক্ষ হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

৫ বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

দক্ষ জনশক্তি জাতীয় উন্নয়নের একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ফলে বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন কৌশল ও পদ্ধতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। উন্নয়নশীল দেশগুলো আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ব্যবসা বাণিজ্য, পরিবহন, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত অসম ও প্রতিকূল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এ অসম-প্রতিযোগিতায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি ও শ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক এবং তথ্যপ্রযুক্তিসহ প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে দ্রুত দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। লক্ষণীয় যে, বর্তমানে বিজ্ঞান প্রযুক্তির সম্প্রসারণ গ্রাম বাংলায় কৃষি থেকে শুরু করে যান্ত্রিক নৌকা, যন্ত্রচালিত আখ মাড়াইয়ের মেশিন, রাইস মিল, যোগাযোগ সেক্টর, বিদ্যুতায়ন, পাওয়ার লুম, যন্ত্রচালিত তাঁত ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই দ্রুত ঘটছে। এগুলোর উন্নতি ছাড়াও তথ্য প্রযুক্তি (ICT)-র সংযোজন ঘটাতে হবে। দেশের প্রয়োজন মেটানো ছাড়াও বিদেশে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা রয়েছে এবং ভবিষ্যতে এই চাহিদা আরো বাড়বে। কাজেই দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রায় দেশের আয় অনেক বৃদ্ধি সম্ভব। দেশের ও আন্তর্জাতিক চাহিদা বিবেচনায় রেখে দক্ষ জনশক্তি তৈরির কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

- তাই লক্ষ্য হচ্ছে, দেশ ও বিদেশের চাহিদা বিবেচনায় রেখে সকল ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তিসহ অন্যান্য বিষয়ে বিভিন্ন স্তরের মানসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তির দ্রুত সম্প্রসারণ।

কৌশল

১. দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদরাসা শিক্ষাসহ প্রাথমিক স্তরের সকল ধারায় প্রাক-বৃত্তিমূলক ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাক্রম চালু করা হবে। দেশের সকল ছাত্র-ছাত্রীকে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাক-বৃত্তিমূলক ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাসহ ৮ বছর মেয়াদী শিক্ষা অবশ্যই সমাপ্ত করতে হবে।

২. ৮ম শ্রেণী সমাপ্ত করার পর একজন শিক্ষার্থী বৃত্তিমূলক/কারিগরি শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে। এই ধারায় যারা যাবে তারা যেন ধাপে ধাপে তাদের পছন্দের কারিগরি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে (সংযোজনী ৪-এ বৃত্তিমূলক শিক্ষার পথনির্দেশিকা দেয়া হল)।

৩. অষ্টম শ্রেণী সমাপ্ত করার পর ছয়মাসের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে একজন শিক্ষার্থী জাতীয় দক্ষতামান-১ জনশক্তি হিসেবে পরিচিত হবে। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় নবম, দশম ও দ্বাদশ শ্রেণী সমাপ্ত করে একজন যথাক্রমে জাতীয় দক্ষতামান ২, ৩ ও ৪ অর্জন করতে পারবে।

৪. অষ্টম শ্রেণী সমাপ্ত করার পর শিল্প-কারখানা এবং উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে স্থাপিত সরকারী টেকনিকাল ইন্সটিটিউট বা বে-সরকারী বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে দেওয়া ১, ২ ও ৪ বছরের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ নিয়েও যথাক্রমে জাতীয় দক্ষতামান ২, ৩ ও ৪ অর্জন করতে পারবে।

৫. দশম শ্রেণী উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা এবং জাতীয় দক্ষতামান-৪ এর সনদধারীরা ক্রেডিট সমন্বয়ের মাধ্যমে ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হতে পারবে। তবে বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রম থেকে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

৬. কারিগরি ডিপ্লোমা পর্যায়ে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীকে যোগ্যতা যাচাই করে ক্রেডিট সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্নাতক পর্যায়ের উচ্চ শিক্ষা কোর্সে (ইঞ্জিনিয়ারিং, টেক্সটাইল, কৃষি ইত্যাদি) ভর্তির সুযোগ দেয়া হবে।

৭. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১ ঃ ১২।

৮. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সকল শিক্ষাক্রমে যথাযথ দক্ষতা অর্জনের বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হবে। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার সকল সম্বারের শিক্ষাক্রমে কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৯. ১৯৬২ সালের শিক্ষানবিশী আইনকে যুগোপযুগী করে দেশে ব্যাপক ভিত্তিতে শিক্ষানবিশ (অ্যাপ্রেনটিসশীপ) কার্যক্রমের প্রবর্তন করা হবে।

১০. প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় অংশগ্রহণের দিকে বিশেষ নজর দেয়া হবে।

১১. সর্বস্তরের সকল শিক্ষকের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে শিল্প কারখানায় বাস্তব প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সকল বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ভিটিটিআই ও টিটিটিসি-এর আসন এবং প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও বৃদ্ধি করে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করতে হবে।

১২. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার জন্য বাংলা ভাষায় পর্যাপ্ত মানসম্মত পুস্তক প্রণয়ন, অনুবাদ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করা হবে।

১৩. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলায় একটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে। এছাড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, লেদার ইনস্টিটিউট সহ এ ধরণের অন্যান্য ইনস্টিটিউটের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।

১৪. মাধ্যমিক স্কুল/বৃত্তিমূলক কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদিতে কারিগরি শিল্প, কৃষি, ব্যবসা বাণিজ্য, নার্সিং, প্যারামেডিকেল ইত্যাদি বিষয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৫. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সুসংহত করার জন্য দেশের সমস্ত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হবে। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরকে তথ্যপ্রযুক্তি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কাউন্সিলে রূপান্তর করে যথাযথ নজরদারি সাপেক্ষে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেয়া যেতে পারে। কাউন্সিলকে আর্থিক সংস্থান ও জনবল দিয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৬. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা খাতে শিক্ষার্থীদের আনুপাতিক হারে সরকারী বরাদ্দ দেয়া হবে।

১৭. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ঘাটতি পূরনের জন্য স্বতন্ত্র কারিগরি শিক্ষক নিয়োগ ও উন্নয়ন কমিশন গঠনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১৮. নতুন নতুন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে এবং সেগুলোর ব্যবস্থাপনা পর্যায়ক্রমে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ ব্যবস্থা অনুসরণ করা যেতে পারে। তবে এগুলোতে সাধারণ পরিবারের ছেলে-মেয়েদের পড়ার সুযোগ থাকতে হবে।

১৯. প্রকৌশল ডিপ্লোমা ও অন্যান্য ডিপ্লোমা পর্যায়ের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানের ভৌত সুবিধাদির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোর্সগুলো দুই শিফটে চালু রাখা যায়। তবে নির্ধারিত পাঠদান সময় মানসম্মত পর্যায়ে থাকতে হবে।

২০. বৃত্তিমূলক ও ডিপ্লোমা পর্যায়ের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুবিধাদি ব্যবহার করে সান্ধ্যকালীন ও খন্ডকালীন শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে স্কুল পরিত্যাগকারী ও বয়স্কদের স্থানোপযোগী বিভিন্ন ধরণের বৃত্তিমূলক শিক্ষাদান করে তাদেরকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার চেষ্টা করা হবে।

২১. যারা ৮ম শ্রেণী বা মাধ্যমিক পর্যায়ের যে কোনো শ্রেণীর পরবর্তী পর্যায়ে যে কোনো (আর্থিক, পারিপার্শ্বিক) কারণে পড়বে না তাদেরকে বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা এবং তারা যাতে তাদের নির্বাচিত কারিগরি শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়ক উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। আগামী দশ বছরের মধ্যে এরকম শিক্ষার্থীদের অধিকাংশকে বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রমে নিয়ে আসা হবে।

২২. বেসরকারী খাতে মান সম্পন্ন বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উৎসাহিত করা হবে এবং এমপিও ভুক্তিতে অগ্রাধিকার প্রদান এবং যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জামসহ আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। বেসরকারী বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

২৩. ভবিষ্যতে কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৬ মাদরাসা শিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

মাদ্রাসা শিক্ষায় ইসলাম ধর্ম যথাযথ শেখানো হবে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জীবনধারণ সংক্রান্ত ও বিভিন্ন জাগতিক কাজকর্মে পারদর্শী হয়ে ওঠা ও উৎকর্ষ সাধন করার জন্য জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যথার্থ জ্ঞান লাভের ব্যবস্হা করা হবে। সাধারণ বা ইংরেজি মাধ্যমে পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে প্রতিযোগিতায় তারা যেন সমানভাবে অংশ নিতে পারে সেই লক্ষ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা এভাবে ঢেলে সাজাতে হবে :

- ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা ও তাঁর রাসূল (স)-এর প্রতি অটল বিশ্বাস গড়ে তোলা এবং তাদেরকে আচার সর্বস্ব নয়, বরং শান্তির ধর্ম ইসলামের প্রকৃত মর্মার্থ অনুধাবনে সক্ষম করে তোলা। তারা এমনভাবে তৈরি হবে যেন তারা ইসলামের আদর্শ ও মর্মবাণী ভাল করে জানে ও বুঝে, সে অনুসারে নির্ভরযোগ্য চরিত্রের অধিকারী হয় এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে সেই আদর্শ ও মূলনীতির প্রতিফলন ঘটায়।

- পাশাপাশি শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে অন্যান্য ধারার সঙ্গে মাদরাসা শিক্ষায় অভিন্ন বিষয়সমূহ অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে বাধ্যতামূলকভাবে পড়ানো হবে।

কৌশল

১. বর্তমানে মাদরাসা শিক্ষা জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে প্রতিষ্ঠিত। এই শিক্ষার স্বকীয়তা বজায় রেখে একে আরও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে যাতে এ শিক্ষাব্যবস্থা নতুন প্রাণরসে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে।

২. বর্তমানে বাংলাদেশে ইবতেদায়ি পাঁচ বছর, দাখিল পাঁচ বছর, আলিম দুই বছর, ফাযিল দুই বছর ও কামিল দুই বছর মেয়াদি রূপে প্রচলিত আছে। একে পুনর্বিন্যাস করে অন্যান্য ধারার সঙ্গে সমতা রক্ষার লক্ষ্যে ইবতেদায়ি আট বছর এবং দাখিল চার বছর করা হবে। উচ্চ শিক্ষার সাথে সমন্বয় রেখে ফাযিল তিন/চার বছর, কামিল দুই/এক বছর মেয়াদি করা যেতে পারে।

৩. শিক্ষার অন্যান্য ধারার সাথে সমন্বয় রেখে ইবতেদায়ি পর্যায়ে নির্দিষ্ট শ্রেণীর শিক্ষাক্রম অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয়সমূহ, অর্থাৎ বাংলা, ইংরেজি, নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ স্টাডিজ, গণিত, সামাজিক পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণাসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতি, তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হবে। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা প্রদান করা হবে। দাখিল পর্যায়ে বাংলা, ইংরেজি, গণিত (দশম শ্রেণী পর্যন্ত), তথ্যপ্রযুক্তি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা বাধ্যতামূলক থাকবে ।

৪. সাধারণ শিক্ষার ন্যায় মাদরাসা শিক্ষার শিক্ষকদের জন্য উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সুযোগ সমভাবে উন্মুক্ত রাখা হবে। এই উদ্দেশ্যে গাজীপুরে স্থাপিত মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণের সুযোগ আরো সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেয়া হবে।

৫. অন্যান্য ধারার মত একই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে ইবতেদায়ি ও দাখিল পর্যায়ে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইংরেজী, বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর জোর দেয়া হবে যেন শিক্ষার্থীগণ দেশে ও বিদেশে নিয়োগক্ষেত্রে চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নিজকে গড়ে তোলার সুযোগ পায়। এ উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে মাদরাসাগুলোতে পর্যায়ক্রমে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ন্যায় শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি সরবরাহ সাপেক্ষে ল্যাবরেটরি স্থাপন, এবং ভৌত অবকাঠামো নির্মাণসহ প্রয়োজনীয় সুবিধাদির সৃষ্টি করতে হবে।

৬. সাধারণ শিক্ষার ন্যায় মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কার, শিক্ষা উপকরণ, বৃত্তিদান, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ ইত্যাদির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং খেলাধুলার সরঞ্জাম ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের ব্যবস্হা করতে হবে।

৭. মাদ্রাসা শিক্ষার ইবতেদায়ি, আলিম স্তরে স্বীকৃতি প্রদান, নবায়ন, ধর্মীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ, সনদ প্রদান ইত্যাদি কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডকে প্রয়োজনের নিরিখে পুনর্গঠন করে আরও সুসংগঠিত ও কার্যকর করতে হবে।

৮. সাধারণ শিক্ষা ধারায় অনুসৃত শিক্ষার্থী মূল্যায়ন প্রক্রিয়া মাদরাসা শিক্ষা ধারায় অনুসরণ করতে হবে। তবে ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে (যথা- ইংরেজী, বাংলা, গণিত, বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়, কলা, কারিগরি শিক্ষা) বিভিন্ন পর্যায়ে প্রান্তিক মূল্যায়ন করবে নিজ নিজ দায়িত্ব অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বা প্রস্তাবিত তথ্যপ্রযুক্তি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কাউন্সিল। ধর্মীয় শিক্ষার মূল্যায়ন মাদরাসা বোর্ডের দায়িত্বে থাকবে।

৯. মাদরাসা শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই শিক্ষার সকল স্তরে সুচারুরূপে পরিচালনা তদারকি, সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিতরূপে স্থানীয় জন-তদারকি, পরিবীক্ষণ ও অ্যাকাডেমিক পরিদর্শনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১০. মাদরাসা শিক্ষার উচ্চ অর্থাৎ ফাজিল ও কামিল পর্যায়ে শিক্ষাক্রম/পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন, শিক্ষাঙ্গনগুলোর তদারকি ও পরিবীক্ষণ এবং পরীক্ষা-পরিচালনাসহ সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব বর্তমানে কুষ্টিয়াস্থ ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত। একটি নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এই বিশাল দায়িত্ব পালন দুরূহ বলে মাদরাসা বোর্ডকে অনুমোদনকারী (অ্যাফিলিয়েটিং) ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করে এ দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। বর্তমানে মাদরাসা বোর্ড যে দায়িত্ব পালন করছে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি শাখা সেসকল দায়িত্বও পালন করবে।

১১. মাদরাসা শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ে এবং সাধারণ শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ের মধ্যে ডিগ্রির সমতা সরকার নির্ণয় করবে।

৭ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর বাংলাদেশের মূল চারটি ধর্ম সম্পর্কে পরিচিতি, আচরণগত উৎকর্ষসাধন এবং জীবন ও সমাজে নৈতিক মানসিকতা সৃষ্টি ও চরিত্র গঠন। বর্তমানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীর জন্য নিজ নিজ ধর্মীয় বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

এই শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ

- প্রচলিত ব্যবস্থাকে গতিশীল করে যথাযথ মানসম্পন্ন ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদান।
- প্রত্যেক ধর্মে ধর্মীয় মৌল বিষয়সমূহের সঙ্গে নৈতিকতার উপর জোর দেয়া হবে। ধর্মশিক্ষা যাতে শুধু আনুষ্ঠানিক আচার পালনের প্রতি জোর না দিয়ে চরিত্র গঠনে সহায়ক হয় সেদিকে নজর দেয়া আবশ্যক।

কৌশল

ক. ইসলাম ধর্ম শিক্ষা

১. শিক্ষার্থীদের মনে আল্লাহ, রাসুল ও আখিরাতের প্রতি অটল ঈমান ও বিশ্বাস যাতে গড়ে ওঠে এবং তাদের শিক্ষা যেন আচার সর্বস্ব না হয়ে তাদের মধ্যে ইসলামের মর্মবাণীর যথাযথ উপলব্ধি ঘটায় সেইভাবে ইসলাম ধর্ম শিক্ষা দেয়া হবে।

২. ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত হওয়ার জন্য উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করতে হবে।

৩. কলেমা, নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাতের তাৎপর্য বর্ণনাসহ যথার্থভাবে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করা হবে।

৪. শিক্ষার্থীর চরিত্রে মহৎ গুণাবলি অর্জন ও তাদের নৈতিক চরিত্র গঠনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেয়া হবে।

খ. হিন্দুধর্ম শিক্ষা

১. প্রকৃতি ও পরিবেশকে জানার মধ্য দিয়ে সবকিছুর মূলে যে ঈশ্বর আছেন, ধর্মের মূল যে ঈশ্বর, সৃষ্টি তত্ত্ব এবং হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা দেওয়া হবে।

২. ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এবং ধর্মানুমোদিত পথে জীবন যাপনের লক্ষ্যে জ্ঞান অর্জনের জন্যে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করতে হবে।

৩. নীতিবোধ জাগ্রত করার সহায়ক হিসেবে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের গল্প-উপাখ্যান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেয়া হবে।

৪. শিক্ষার্থীকে মানবতাবোধ, মহানুভবতা, সৎ-সাহস ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা হবে।

গ. বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা

১. সিদ্ধার্থের বিভিন্ন বিদ্যা শিক্ষায় পারদর্শিতা, চার নিমিত্ত দর্শন, মার বিজয় ও অন্তিম উপদেশের বিষয়ে পাঠদান করা হবে।

২. ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এবং ধর্মানুমোদিত পথে জীবন যাপনের উপযোগী করে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলার জন্যে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করতে হবে।

৩. গৌতম বুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত কাহিনী ও গল্পের মাধ্যমে নীতিবোধ জাগ্রত করা এবং পার্থিব জীবনের সুখ বিলাস অর্থ-সম্পদ যে কিছুই সঙ্গে যাবে না, কর্মই জীবনের একমাত্র পাথেয় গুরুত্বসহকারে সেই শিক্ষা দেওয়া হবে।

৪. শিক্ষার্থীকে সামাজিক ও জাতীয় চেতনায় নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করে গড়ে তোলা হবে।

ঘ. খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা

১. যিশুর জীবন, কাজ ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে জীবনের পূর্ণতা লাভের পথ ও পরামর্শ এবং নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

২. খ্রীষ্ট ধর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত হওয়ার জন্যে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হবে।

৩. শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে সুস্থ জীবন যাপন করা এবং অন্যদের সুস্থ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবন যাপনে সাহায্য করতে শিক্ষার্থীকে মানসিকভাবে তৈরি করে গড়ে তোলার জন্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া হবে।

৪. বর্তমান জগতের বাস্তব সমস্যা এবং অন্যায়, অত্যাচার, অনায্যতা, অশান্তির কারণ সম্পর্কে সচেতন করা এবং বাইবেলের শিক্ষার আলোকে তা সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে পালনের যোগ্যতা অর্জনের পথে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া হবে।

ঙ. আদিবাসীসহ অন্যান্য সম্প্রদায় যারা দেশে প্রচলিত মূল চারটি ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের অনুসারী তাদের জন্য নিজেদের ধর্মসহ নৈতিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

প্রত্যেক ধর্ম শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলি ও বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে প্রত্যেক শ্রেণীর প্রান্তিক যোগ্যতা চিহ্নিত করা হবে।

৮ উচ্চশিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য হবে জ্ঞান সঞ্চারণ ও নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবন এবং সেই সঙ্গে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা। বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলোর জন্য স্ব-শাসন ব্যবস্থা অপরিহার্য। তবে তা যথানিয়মে নির্ধারিত নীতিমালার আওতায় বাস্তবায়িত হবে এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ প্রস্তাবিতভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে সরকারী তদারকির ব্যবস্থা থাকবে। বর্তমানে জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানসাধনায় নিযুক্ত বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের সাধনার ক্ষেত্রকে ক্রমাগত সঙ্কুচিত করছেন আপন বিষয়ে গভীরতা অর্জনের প্রয়োজনে, ফলে বিভাজন ঘটছে জ্ঞানের জগতে। অন্যদিকে একটি বিপরীত প্রক্রিয়াও চলছে এবং তা হল জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পারস্পরিক নির্ভরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর ফলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, অর্থনীতি ও অন্যান্য বিষয় পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে উঠছে। তার সঙ্গে যোগ হচ্ছে নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন, বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিকাশ বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার ও বিশ্বজগত সম্পর্কে অভিনব উপলব্ধি। এই পরিপ্রেক্ষিতেই জ্ঞানের জগতে সকল বিচ্ছিন্নতা ও বিভক্তি অতিক্রম করে একটি সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। বর্তমানে প্রচলিত উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা বাংলাদেশের মতো একটি স্বাধীন দেশের প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে মেটাতে সমর্থ নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চ শিক্ষার সামগ্রিক ব্যবস্থায় পুনর্বিন্যাস আবশ্যক। বেসরকারী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং ক্ষেত্র বিশেষে (যথা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ব্যবসায়) বাস্তব প্রশিক্ষণ দিতে পারে সেই আলোকে যথাযথ নিয়মানুসারে চালিত হতে হবে। উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও নীতি নিম্নরূপ:

- কার্যকরভাবে বিশ্বমানের শিক্ষাদান, শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা জাগানো এবং মানবিক গুণাবলী অর্জনে সহায়তা দান।
- অবাধ বুদ্ধিচর্চা, মননশীলতা ও চিন্তার স্বাধীনতা বিকাশে সহায়তাদান করা।
- পাঠদান পদ্ধতিতে সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে দেশের বাস্তবতাকে উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা, রাষ্ট্র ও সমাজের সমস্যা সনাক্ত করা ও সমাধান বের করা।
- নিরলস জ্ঞানচর্চা ও নিত্যনতুন বহুমুখী মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণার ভেতর দিয়ে জ্ঞানের দিগন্তের ক্রমসম্প্রসারণ।
- আধুনিক ও দ্রুত এগিয়ে চলা বিশ্বের সঙ্গে কার্যকর পরিচিতি ঘটানো।
- জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের উপযোগী বিজ্ঞানমনস্ক, অসাম্প্রদায়িক, উদারনৈতিক, মানবমুখী, প্রগতিশীল ও দূরদর্শী নাগরিক সৃষ্টি।

কৌশল

১. বিভিন্ন ধারার মাধ্যমিক শিক্ষা সফলভাবে সমাপ্ত করার পর মেধা, আগ্রহ ও প্রবণতার ভিত্তিতে শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ লাভ করবে।

২. ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করলে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান এবং আদিবাসিসহ ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, বিভিন্ন কারণে পিছিয়ে পড়া এবং অন্যান্য গোষ্ঠির সন্তানদেরকে পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আবাসিক সুবিধা সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ ও বৃত্তি প্রদানসহ বিশেষ সহায়তা দেওয়া হবে।

৩. শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করতে পারে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে, যেমন, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, উচ্চশিক্ষা প্রদান করা হবে। কোটা পদ্ধতি বা অন্য কারণে ন্যূনতম যোগ্যতার শর্ত শিথিল করা হবে না।

৪. উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নে সর্বপ্রকার যত্ন নিতে হবে ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫. চার বছরের সম্মান স্নাতক ডিগ্রীকে সমাপনী ডিগ্রী হিসেবে এবং উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষকতা ব্যতীত অন্য সকল কর্মক্ষেত্রে যোগদানের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হবে। যে সকল কলেজে তিন বছরের স্নাতক ডিগ্রী কোর্স চালু আছে পর্যায়ক্রমে সেখানেও চার বছরের স্নাতক সম্মান ডিগ্রী কোর্স চালু করা হবে।

৬. মাস্টার্স, এম.ফিল বা পি.এইচডি-কে বিশেষায়িত শিক্ষা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এবং শুধুমাত্র গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষকতা করতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদেরকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করতে হবে। গবেষণা নিশ্চিত করার জন্যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগে পর্যায়ক্রমে গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম চালু করে সেখানে নিয়মিতভাবে মাস্টার্স, এমফিল ও পি.এইচডি ডিগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। সাধারণত মাস্টার্স এক বছরের, এমফিল দু বছরের এবং পিএইচডি রেজিষ্ট্রেশনের সময় হতে ছয় বছরের মধ্যে শেষ করতে হবে।

৭. বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে সকল ডিগ্রি কোর্স পর্যায়ে ১০০ নম্বরের/৩ ক্রেডিট ইংরেজি বিষয় সকল শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

৮. গবেষণার কাজে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে একযোগে অংশগ্রহণ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মৌলিক গবেষণার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের গবেষণার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট সংখ্যক আকর্ষনীয় মূল্যের গবেষণা অনুদান এবং সম্প্রতি প্রবর্তিত বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ ছাড়াও আরো ফেলোশিপের ব্যবস্থা করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে ডিগ্রি কলেজগুলোতে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

৯. উচ্চশিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি হবে আধুনিক ও আন্তর্জাতিকমানের। উচ্চশিক্ষায় বাংলায় সম্প্রসারিত ও সমৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ইংরেজিসহ অন্যান্য ভাষায় রচিত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যবহারযোগ্য গুরুত্বপুর্ণ রচনা বাংলা ভাষায় ভাষান্তরিত হওয়া প্রয়োজন। এই কাজকে জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ গণ্য করে ব্যবস্হা গ্রহণ জরুরি। উচ্চশিক্ষায় বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি ব্যবহার চালু থাকবে।

১০. উচচশিক্ষার আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার জন্য শিক্ষাখাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করতে হবে। সরকারি অনুদান ছাড়াও উচচশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যয় নির্বাহের জন্য শিক্ষার্থীর বেতন ব্যবহার করতে হবে এবং ব্যক্তিগত অনুদান সংগ্রহের চেষ্টা চালাতে হবে। বাংলাদেশে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে ভর্তি ফি ও বেতন খুবই সামান্য। অভিভাবকের আর্থিক সচছলতার প্রত্যয়ন পত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বেতন নির্ধারণের চেষ্টা করা হবে। এতে অসচছল অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হবে। অসচছলতা প্রমাণের মূল দায়িত্ব অভিভাবকের উপর ন্যস্ত থাকবে তবে তার জন্য যথাযথ নিয়মনীতি প্রণয়ন করতে হবে।

১১. মেধা ও অভিভাবকের আর্থিক সচ্ছলতার নিরিখে শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃত্তি প্রদান করা হবে। তাছাড়া মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা মেধার ভিত্তিতে সহজ শর্তে যেন ব্যাংক ঋণ পেতে পারে সে ব্যবস্হা করতে হবে।

১২. বাংলাদেশের বিকাশমান অর্থনীতিতে পাট, বস্ত্র ও চামড়া খাতের বিপুল গুরুত্ব ও সম্ভাবনার কথা বিবেচনায় রেখে পাট গবেষণা ইন্সটিটিউট, টেক্সটাইল কলেজ ও কলেজ অব লেদার টেক্নোলজিকে অধিকতর শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। ক্ষেত্র বিশেষে ভবিষ্যতে বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় খোলা যেতে পারে।

১৩. প্রত্যেক কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হবে। ইলেকট্রনিক গ্রাহক হিসেবে সকল গবেষণা জার্নাল সংগ্রহ করা হবে। গ্রন্থাগারগুলো নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে সংযুক্ত করা হবে যেন যেকোনা শিক্ষার্থী অন্য যেকোনো গ্রন্থাগারের সুযোগ সুবিধাগ্রহণ করতে পারে। পর্যায়ক্রমে বই ও জার্নালসমূহের ডিজিটাল সংস্করণ করতে হবে।

১৪. শিক্ষকদের রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা জরুরি। এই লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছুটির সময় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষক সমন্বয়ে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ-সেমিনারের ব্যবস্থা করতে হবে। অ্যাকাডেমিক বছরের বিন্যাস এমনভাবে করা যেতে পারে যেন এক সঙ্গে দুই থেকে তিন মাস পর্যন্ত ছুটি থাকে।

১৫. প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ নির্ধারিত অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার (academic calender) অনুসরণ করবে। নতুন শিক্ষার্থীদের শিক্ষা-প্রদান কোন তারিখে শুরু হবে, কোন পরীক্ষা কখন হবে ইত্যাদি সারা বছরের কর্মসূচী সংবলিত এই অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার অ্যাকাডেমিক বছর শুরু হওয়ার আগে মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করতে হবে।

১৬. দেশের উচ্চশিক্ষার স্বার্থে প্রস্তাবিত ও অনুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি ও শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নির্ধারিত উপযুক্ত মানের হতে হবে। এই সব বিশ্ববিদ্যালয় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, আর্থ-সামাজিক অবস্থান, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নির্বিশেষে কোনো কারণেই বৈষম্যমূলক হতে পারবে না, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনা করা যাবে না এবং স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং বাঙালী সংস্কৃতির বিরোধী হতে পারবে না।

১৭. উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণায় উৎসাহিত করা এবং প্রতিষ্ঠানের গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কনসালটেন্ট ব্যবস্হা প্রতিষ্ঠা করার পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। যে সকল শিক্ষক এ ধরণের প্রকল্পে কাজ করবেন তাদের যথোপোযুক্ত সম্মানী প্রদান করতে হবে। এরকম গবেষণা কার্যক্রম বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু আছে। এই কার্যক্রম মূল্যায়ন করে প্রয়োজনে পরিমার্জন করে একটি দিকনির্দেশনা-কাঠামো তৈরি করা যায়।

১৮. টেলিভিশনে সুবিধাজনক কোনো চ্যানেলে - যেমন বিটিভিতে দ্বিতীয় চ্যানেলে-অধিকতর সময়, রেডিও ট্রান্সমিশন, মাল্টি ইনফরমেশন সিস্টেম উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য চালু করা একান্ত প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

৯ প্রকৌশল শিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। বর্তমানে উন্নত দেশগুলোতে তো বটেই, আমাদের সমাজেও সাধারণ মানুষের জীবনে সকল ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং তথ্য প্রযুক্তিজ্ঞান এবং এগুলোর প্রয়োগ হয়ে পড়েছে একান্ত অপরিহার্য। এর ফলে সামাজিক জীবনযাত্রার পট পরিবর্তন হচেছ এবং সমাজ জীবনের কার্যধারাতেও আসছে গতিশীল পরিবর্তন। একবিংশ শতাব্দীতে প্রকৌশল বিষয়ে শিক্ষাক্রম অনেক বদলে যাবে। প্রকৌশল ও কারিগরি শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে-

- সমাজে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন, বাস্তবধর্মী, দক্ষ প্রকৌশলী ও কারিগরি জনশক্তি গড়ে তোলা যাতে তারা দেশের উন্নয়নে, প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে, দারিদ্র দূরীকরণে এবং সমাজ ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে কার্যকর অবদান রাখতে পারেন।
- সর্বক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির উপর জোর দেয়া হবে যাতে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর জ্ঞানভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ায় তারা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেন।

কৌশল

১. বর্তমান প্রযুক্তি ও পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পরিবেশ, উন্নয়ন, উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে দেশ ও আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ প্রকৌশলী সরবরাহ করার জন্য প্রকৌশল বিদ্যায়তনগুলোতে আসন সংখ্যা বর্ধিত করতে হবে। প্রয়োজনে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২. দেশের সম্পদ উন্নয়ন ও বিভিন্ন কারিগরি সমস্যার সমাধান ও উচচ মানসম্পন্ন প্রকৌশলী তৈরির জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা ও স্নাতকোত্তর কোর্সের প্রতি অধিকতর নজর দেওয়া হবে। গবেষণার মূল এলাকাগুলো হবে দেশীয় শিল্পের প্রকৌশলগত সমস্যা বিষয়ক। পেশায় নিযুক্ত স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী প্রকৌশলীদের জন্য বাড়তি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন।

৩. দেশের বৃহৎ শিল্পগুলোতে তথ্য প্রযুক্তি, প্রকৌশল, রসায়ন, বস্ত্র, পাট, চামড়া, সিরামিক ও গ্যাস শিল্প সহ বিভিন্ন শিল্পর জন্য উপযুক্ত প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদ তৈরির জন্য অবিলম্বে বিকাশমান বিষয়ে কোর্স চালুসহ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নতুন নতুন ফ্যাকাল্টি চালু করা বাঞ্ছনীয়। এ সকল বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অনুমতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অতিরিক্ত খরচ সংবলিত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অর্থ-প্রাপ্তি বিষয়ে নিশ্চিত হয়েই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৪. প্রকৌশল তথ্যপ্রযুক্তি ও প্রযুক্তিবিদ্যার কোর্সগুলোকে অধিকতর ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির নিয়মিত হালনাগাদসহ শিল্প কারখানা ও কারিগরি সংস্থাসমূহে শিক্ষার্থীদের সহায়ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৫. প্রকৌশল শিক্ষায়তনের সঙ্গে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর সংযোগ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এক্ষেত্রে নবিবিশি শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা চালুসহ দেশের সকল পর্যায়ের চেম্বার অব কমার্স এবং চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিগুলোর প্রকৌশল শিক্ষায়তনের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

৬. প্রকৌশল শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের সময়ে অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ের ওপরে জোর দেওয়া হবে।

৭. বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জীবনচক্র ছোট হয়ে যাওয়ায় এবং নতুন নতুন প্রযুক্তি, বিশেষ করে তথ্য প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হওয়ায়, চাকরিতে নিয়োজিত পেশাজীবী প্রকৌশলীদের অব্যাহত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং অব্যাহত পেশাগত উন্নয়নের ব্যবস্থা ব্যাপকহারে চালু করতে হবে।

৮. ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের মেধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী দেশের প্রকৌশল বিদ্যায়তনে, যথা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে, উচ্চতর শিক্ষার জন্য ভর্তি পরীক্ষা যথাযোগ্য ক্রেডিট সমন্বয়ের মাধ্যমে হতে পারবে।

৯. দেশের প্রচলিত বিভিন্ন স্তরে কারিগরি ও প্রকৌশল শিক্ষার মূল্যায়ন ও মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত পেশাগত ও বিশেষজ্ঞ সংস্থার মূল্যায়ন ও স্বীকৃতিদানের ব্যবস্থা করা দরকার। সেই লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

১০. টেক্সটাইল ইনজিনিয়ারিং কলেজ ও টেকনিক্যাল টিচার্স কলজেগুলোকে আরো শক্তিশালী করা উচিত। লেদার টেকনোলজি কলেজ সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য।

১১. প্রকৌশল ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা উৎসাহিত করতে হবে। এই বিষয়ে সরকারের দিকনির্দেশনা প্রদানসহ সমন্বয়, পরিবীক্ষণ এবং অর্থায়নে সহায়তা দেওয়ার দায়িত্ব থাকবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের।

১২. প্রতি বছরের জন্য অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার নির্ধারন ও অনুসরণ করতে হবে।

১০ চিকিৎসা, সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

একটি সুস্থ সবল জনগোষ্ঠীই শুধু দেশকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এর জন্যে প্রয়োজন স্বাস্থ্য সচেতনতা, প্রয়োজনীয় রোগ প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ এবং যথাযথ চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা। যথাযথ শিক্ষার মাধ্যমে সেই লক্ষ্যে এই দেশে প্রয়োজনীয় চিকিৎসক, সেবক-সেবিকা, স্বাস্থ্যকর্মী এবং বিশেষজ্ঞদের গড়ে তুলতে হবে। একদিকে শিক্ষার্থীরা যেন তাদের পেশাগত দক্ষতা অর্জন করে অন্যদিকে তারা যেন সংবেদনশীল বিবেকবান মানুষ হিসেবে গড়ে উঠে সে জন্যে চিকিৎসা সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে নিম্নরূপ।

চিকিৎসা সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ

দেশের সমস্ত অধিবাসীকে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে স্বাস্থ্যবান ও কর্মক্ষম রাখার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্ত মানের চিকিৎসক, সেবক-সেবিকা, স্বাস্থ্যকর্মী ও সকল প্রকারের বিশেষজ্ঞ তৈরি করা।

- প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সকলের জন্য সরকারিভাবে নিশ্চিত করার জন্যে প্রয়োজনীয় জনবল তৈরি করা হবে।
- চিকিৎসা পেশা অন্যান্য সকল পেশার চেয়ে স্পর্শকাতর, শারীরিক ও মানসিক কষ্ট/অসুস্থতা তথা জীবন-মৃত্যুর সমস্যার সঙ্গে জড়িত বলে চিকিৎসক, সেবক-সেবিকাসহ সকল স্বাস্থ্যকর্মী যেন সংবেদনশীল বিবেকবান মানুষ হিসেবে মানুষের সেবায় নিয়োজিত হন সেই জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।
- দেশের ব্যাধি ও চিকিৎসা সমস্যাবলীর মোকাবিলায় উপযুক্ত চিকিৎসা শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞ তৈরির লক্ষ্যে উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- চিকিৎসা বিজ্ঞানের সকল উন্নতির সুফল দেশের জনগণের, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিশেষজ্ঞ, সেবক-সেবিকা ও স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসা কৌশলীদের জন্য শিক্ষা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা ও এদের সবাইকে সামাজিক ও মানব সেবায় অনুপ্রাণিত করা।
- চিকিৎসা বিষয়ে গবেষণা করে এ দেশের নিজস্ব রোগ ব্যাধির চিকিৎসার ক্ষেত্রে নূতন পদ্ধতি বের করা।

কৌশল

১. মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য মাধ্যমিক শেষে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া অব্যাহত থাকবে। কোন প্রার্থী দুই বছরের বেশি ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে না।

২. মেডিকেল কলেজে পাঁচ বছরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অব্যাহত থাকবে এবং এক বছরের ইন্টার্নশিপ থাকবে।

৩. স্নাতকোত্তর চিকিৎসার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য অধিক সংখ্যক চিকিৎসা-শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞ তৈরি করা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বিভিন্ন বিভাগীয় সদরে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিকাল ইন্সটিটিউট স্থাপনের পদক্ষেপ নেয়া যায়।

৪. সকল মেডিকেল কলেজের শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে হবে। বাস্তব শিখনের লেবরেটরিগুলোতে যথোপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যবস্থা যথাযথভাবে গ্রহণ করা হবে।

৫. মানসম্পন্ন নার্সিং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সম্প্রসারিত করা হবে। এই পেশার চাহিদা দেশে এবং বিদেশে রয়েছে এবং বাড়ছে।

৬. নার্সিং কলেজে বিএসসি ও এমএসসি নার্সিং কোর্স খোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

৭. নার্সিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে অবশ্যই কোন হাসপাতালের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে।

৮. মানসম্পন্ন প্যারামেডিকেল শিক্ষার সুযোগ বাড়ানো হবে। এ ক্ষেত্রে ভর্তির যোগ্যতা ন্যূনতম ১০ম শ্রেণী বা সমমানের হবে।

৯. আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার পাশাপাশি ঐতিহ্যগতভাবে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত হোমিওপ্যাথি, ইউনানি ও আয়ুর্বেদী চিকিৎসা ব্যবস্থারও উন্নয়ন সাধনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

১০. প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলোতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণদান যেন উপযুক্ত মানসম্পন্ন হয় তা নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। নতুন প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অনুমোদন দেওয়ার সময় প্রকল্পের মূল্যায়ন যেন যথাযথ হয় সেদিকে কঠোর নজর রাখা হবে। এই মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন করার জন্য যথাযথ ক্ষমতাসম্পন্ন ও দক্ষ জনবল সংবলিত মেডিকাল অ্যাক্রেডিশান কাউন্সিল গঠন করা যায়।

১১. মেডিকেল কলেজের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ডেন্টাল, ফিজিওথেরাপী ও ক্লিনিক্যাল সাইকোলজীসহ অন্যান্য শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে।

১১ বিজ্ঞান শিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

বিজ্ঞানের মূল কাজ হচ্ছে প্রকৃতিকে অনুধাবন করা। পরীক্ষা নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ এবং গাণিতিক যুক্তি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান প্রকৃতির রহস্যকে উন্মোচন করে যাচ্ছে। এটি একদিকে মানবজাতির অজানাকে জানার কৌতূহলকে পূরণ করে, অন্যদিকে বিজ্ঞানের লব্ধ জ্ঞান প্রতিনিয়তই নানা ধরণের প্রযুক্তির ব্যবহারের ভেতর দিয়ে মানব সভ্যতাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। শুধুমাত্র সঠিক বিজ্ঞান শিক্ষাই একটা জাতিকে দ্রুত তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে।

কাজেই বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য হবে-

- শিক্ষার্থীদের এমনভাবে প্রস্তুত করা যেন তারা প্রতিভা বিকাশ, জ্ঞান সাধনা এবং সৃজনশীলতায় আন্তর্জাতিক মান অর্জন করতে পারে।
- বিজ্ঞানের শিক্ষার সাথে প্রযুক্তি শিক্ষা এবং মানবিক শিক্ষার যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে এবং তাদের একটি অন্যটির পরিপূরক এই বিষয়টি মাথায় রেখে একটা সমন্বিত শিক্ষার অংশ হিসেবে বিজ্ঞান শিক্ষাকে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা।

কৌশল

প্রাথমিক শিক্ষা

১. বিজ্ঞান শিক্ষা একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকেই শুরু হবে। তথ্য দিয়ে ভারাক্রান্ত না করে তাদেরকে বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হবে প্রকৃতি, পরিবেশ এবং পারিপার্শিক ঘটনাবলির সাথে পরিচিত করে। শুরু থেকেই তাদেরকে বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তুলতে হবে।

২. শ্রেণী কক্ষে শিক্ষাদানের পাশাপাশি তাদের জন্যে নানারকম চিত্র, ভিডিও প্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ এবং হাতের কাছে থাকা উপকরণ ব্যবহার করে নিজেদের পক্ষেই সহজেই করা সম্ভব এরকম সহজ পরীক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ও প্রশ্ন করার প্রবণতাকে শিক্ষক সবসময়েই উৎসাহিত করবেন। নানারকম তথ্য মুখস্ত না করে তথ্যগুলোকে জীবনের নানা ক্ষেত্রে ব্যবহারের ক্ষমতাকে বিকশিত করতে সাহায্য করবেন।

৪. প্রাথমিক স্তরের ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার একটি সমন্বিত কোর্স থাকবে। পাঠ্যপুস্তক সহজবোধ্য, সচিত্র এবং আকর্ষণীয় করে লেখা হবে। স্বাস্থ্য ও প্রজনন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় পাঠদান করা হবে, তবে কোনক্রমেই অহেতুক বেশী তথ্য দিয়ে তাদের ভারাক্রান্ত করা হবে না।

মাধ্যমিক শিক্ষা

৫. বিজ্ঞান শিক্ষার সাথে গণিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত বলে শিক্ষার্থীদের গণিত শিক্ষায় জোর দিতে হবে। বিজ্ঞান শাখার ছাত্রছাত্রীদের জন্যে উচ্চতর গণিত বাধ্যতামূলক করতে হবে। গণিত বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রীধারীদের গণিতের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে।

৬. শিক্ষার্থীরা যেন পঠিত বিজ্ঞান শাখাগুলোর মৌলিক বিষয়গুলো সুষ্ঠু ভাবে জানতে পারে, তার সমস্যা সমাধান করতে পারে এবং বাস্তব জীবনে ব্যবহার করতে পারে সেভাবে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং পাঠদান করতে হবে।

৭. ব্যবহারিক ক্লাশ ছাড়া বিজ্ঞান শিক্ষা অর্থহীন বলে মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান এবং গণিতের প্রতিটি শাখায় নিয়মিত ব্যবহারিক ক্লাশের ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষার যথাযথ মূল্যায়নের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে, যেন ছাত্রছাত্রীদের ঢালাও ভাবে নম্বর দেয়ার সুযোগ না থাকে।

৮. শিক্ষার্থীদের কাছে বিজ্ঞান এবং গণিতকে আকর্ষনীয় করার জন্যে প্রতিটি স্কুলে বাৎসরিক ক্রীড়া বা সাংস্কৃতিক সপ্তাহের সাথে সাথে বিজ্ঞান মেলা বা গণিত অলিম্পিয়াডের আয়োজন করতে হবে। জাতীয় পর্যায়েও বিজ্ঞান মেলা ও গণিত অলিম্পিয়াডের আয়েজন করতে হবে।

পূর্ববর্তী স্তরের সাথে সমন্বয় রেখে মাধ্যমিক শ্রেণীর সিলেবাস প্রণয়ন করতে হবে। শ্রেণী কক্ষে পাঠ গ্রহণের জন্যে শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত সংখ্যক ক্লাস নেয়া নিশ্চিত করা হবে।

৯. একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীকে মাধ্যমিকে অন্তর্ভুক্ত করার আগে পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তরের সাথে সমন্বয় রেখে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর সিলেবাস প্রণয়ন করতে হবে। শ্রেণী কক্ষে পাঠ গ্রহণের জন্যে শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত সংখ্যক ক্লাস নেয়া নিশ্চিত করা হবে।

১০. চার বছরের স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রীকে প্রান্তিক ডিগ্রী হিসেবে গণ্য করা হবে। কাজেই উচ্চতর স্তরে শিক্ষাদান বা গবেষণার কাজে নিযুক্ত হওয়া ভিন্ন অন্য সকল ক্ষেত্রে এই ডিগ্রী পর্যাপ্ত বলে বিবেচনা করতে হবে এবং পাঠ্যসূচিকে সেভাবে গড়ে তুলতে হবে।

১১. শুধুমাত্র গ্র্যাজুয়েট স্কুলেই (স্নাতোকত্তর পর্যায়) নিয়মিত মাষ্টার্স ও পি.এইচডি প্রোগ্রামের মাধ্যমে সত্যিকার গবেষনা করা সম্ভব। কাজেই প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্র্যাজুয়েট স্কুল খুলে সেখানে মাস্টার্স এবং পি.এইচডি প্রোগ্রাম চালু করতে হবে। রাষ্ট্রীয় ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তার সমাধানের লক্ষ্যে গবেষণার আয়োজন করতে হবে। এই গবেষণার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান করতে হবে।

১২. বিজ্ঞান গবেষণার জন্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মাঝে যোগাযোগ ও সহযোগিতা গড়ে তুলতে হবে।

১৩. গবেষণার ফল সবার কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যে গবেষণা জার্ণাল প্রকাশ করতে হবে। একই সাথে পৃথিবীর সকল গবেষণা জার্ণাল দেশের গবেষকদের হাতে পৌঁছানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। তথ্য প্রযুক্তি এবং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশের সকল পাঠাগারের মাঝে যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে।

১৪. গবেষণার পরিবেশ গড়ে তোলার জন্যে নিয়মিত ভাবে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করতে হবে।

১৫. মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহী করার জন্যে তাদের কর্ম সংস্থানের সুযোগ করতে হবে। উন্নত মানের কেন্দ্রীয় গবেষণাগার এবং গবেষণা ইনস্টিটিউট গড়ে তুলতে হবে।

১৬. আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রযুক্তির ব্যবহার এবং শিক্ষাদানের কৌশল ও দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রাথমিক থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৭. বিজ্ঞানের ব্যবহারিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতি থানা/উপজেলায় সরকারী অর্থায়ন ও ব্যবস্হাপনায় বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করে পালাক্রমে ঐ এলাকার স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের আবশ্যিক ব্যবহারিক পাঠদানের ব্যবস্হা নেয়া যেতে পারে।

১২ তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

প্রায় দুই শতাব্দী আগে শিল্প বিপ্লবের কারণে সভ্যতার গতিপ্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছিল, একুশ শতকে তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লবের ভেতর দিয়ে আবার সেই গতিপ্রকৃতি পরিবর্তিত হতে যাচ্ছে। এই তথ্যপ্রযুক্তির বিপবের অংশীদার হয়ে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে দারিদ্র্য বিমোচনের একটি অভাবিত সুযোগ পেয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার করে সর্বক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব। রাষ্ট্র পরিচালনায় স্বচ্ছতা এনে দুর্নীতির মূল্যোৎপাটন করার ক্ষেত্রেও তথ্যপ্রযুক্তি অনেক বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। তাছাড়াও তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ জনশক্তি সরবরাহসহ সম্ভাবনাময় রপ্তানিখাত হিসেবে সফট্‌ওয়্যার, ডাটা প্রসেসিং বা কলসেন্টার জাতীয় service industry বিকাশে আলাদাভাবে গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। শিক্ষানীতির একটি বিশেষ উদ্দেশ্য-

- উপর্যুক্ত কর্মযজ্ঞের জন্যে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় আন্তর্জাতিক মান ও গুণ সম্পন্ন শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরীর প্রচেষ্টা চালানো ।
- এখানে উলেখ্য তথ্যপ্রযুক্তিকে শুধুমাত্র কম্পিউটার বিজ্ঞানের মাঝে সীমিত না রেখে মোবাইল ফোন, রেডিও, টেলিভিশন, নেটওয়ার্কিং কিংবা সকল তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াকরণের ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা প্রয়োজন।

কৌশল

প্রাথমিক, মাধ্যমিক, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা

১. শিক্ষার একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে কম্পিউটারকে শিক্ষা দেয়ার উপকরণ (Tool) হিসেবে ব্যবহার করে শিক্ষা দিতে হবে।

২. উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পৌঁছানোর মধ্যেই সকল ছাত্র-ছাত্রীকে কম্পিউটার ব্যবহারে শিক্ষিত হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

৩. মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান ও গণিতের কোন মূল বিষয় পরিত্যাগ না করেই কম্পিউটার বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে পড়াশোনার সুযোগ করে দিতে হবে।

৪. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় গ্রাফিক্স ডিজাইন, মাল্টিমিডিয়া, অ্যানিমেশন, সিএডি/সিএসএম ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তি অলিম্পিয়াডের আয়োজন করতে হবে।

উচ্চশিক্ষা

৬. সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক মানের কারিকুলামসহ কম্পিউটার বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ খোলা হবে।

৭. কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির শিক্ষার মান যুগোপযোগী না হলে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৮. বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষার্থীদের তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে জাতীয় পরীক্ষা পদ্ধতিতে অংশ গ্রহণ করে তথ্যপ্রযুক্তি জনবলে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। প্রয়োজনে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মাঝে ঘনিষ্ট যোগসূত্র গড়ে তুলতে হবে।

১০. উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে তথ্যপ্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ করে সত্যিকার ভাবে ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

১১. ২০১৩ সালের ভেতর সকল স্নাতক ডিগ্রীধারী যেন কম্পিউটার ব্যবহারের মৌলিক দক্ষতা অর্জন করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

১২. তথ্যপ্রযুক্তিতে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা এবং তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষকদের উচ্চতর প্রশিক্ষণদানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে একটি তথ্যপ্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা যেতে পারে।

অন্যান্য

১৩. তৃনমূল পর্যায়ে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে জেলা উপজেলা পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং টেলিসেন্টার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১৪. সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তা এবং নীতি নির্ধারকদের কম্পিউটার বিষয়ক দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। ভবিষ্যতে নিয়োগের বেলায় কম্পিউটার বিষয়ক দক্ষতা যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হবে।

১৩ ব্যবসায় শিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প, বাণিজ্য ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের অবদান অপরিসীম। শিল্প, বাণিজ্য ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের শাখা সমূহের সমন্বিত ব্যবস্হাকে ব্যবসায় শিক্ষা বলে এই নীতিমালায় অভিহিত করা হচ্ছে। এ শাখায় শিক্ষা যথার্থভাবে আয়ত্ত করতে পারলে চাকরি এবং চাকরির বিকল্প হিসেবে ব্যবসায়কে আত্মকর্মসংস্হান-ভিত্তিক জীবিকার উপায় হিসেবে গ্রহণ করা যায়। বর্তমান বিশ্বে বাজার অর্থনীতির প্রচলন, বিশ্ববিস্তৃত পণ্যের বাজার এবং তীব্র প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপটে দক্ষ ব্যবস্হাপনা ও তার সহায়ক কার্যাবলি প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যের অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে পরিগণিত। তাই বর্তমানে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সকল দেশেই ব্যবসায় শিক্ষার গুরুত্ব ও চাহিদা অতি উঁচু পর্যায়ে পৌঁছেছে। বিভিন্ন স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ ঃ

- ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা করা।
- ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করা।
- একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনের পথ সুগম করা।
- আর্থিক, ব্যবসায়িক ও কর্মী-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভে সহায়তা করা এবং কর্মী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কর্মীর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য দক্ষ ব্যবস্থাপক সৃষ্টি করা।
- শিক্ষা জীবনের কোন স্তরে ঝরে পড়লে জীবন -জীবিকার জন্য আত্মকর্মসংস্থানের পথ সুগম করা।
- প্রতিষ্ঠানের আকারভেদে সাংগঠনিক স্তরের নিম্ন, মাঝারি ও উচ্চ পর্যায়ে কর্মকর্তা/নির্বাহী/ব্যবস্হাপক/ হিসাব কর্মকর্তা, এক কথায় ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রয়োজনানুসারে দক্ষ জনশক্তি সম্পদ সৃষ্টিতে সহায়তা করা।
- কর্মী নির্বাচন ও কর্মীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার জন্য জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করা।
- ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ব্যাংক ব্যবস্থাপনা, বীমা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উচ্চতর প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাগত ডিগ্রী অর্জনের পথ সুগম করা।

কৌশল

১. দেশে ও বিদেশে বাংলাদেশের জনবলের চাহিদার ভিত্তিতে ব্যবসায় শিক্ষার সম্প্রসারণ, পরিমার্জন ও সমন্বয় সাধন করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিতে হবে। এর জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ও ব্যক্তি-খাতের মাঝে সংযোগ সৃষ্টি করতে ও অব্যাহত রাখতে হবে।

২. মাধ্যমিক স্তর অর্থাৎ ৯ম শ্রেণী থেকে থেকে ব্যবসায় শিক্ষা শুরু করতে হবে। প্রথম দু'বছর ব্যবসায় পরিচিতি, হিসাবরক্ষণ ,বিপণন, কম্পিউটারের ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা দেয়া হবে। দ্বিতীয় দু'বছর শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায়োগিক ক্ষেত্রসমূহ সম্বন্ধে জানার আগ্রহ সৃষ্টির জন্য বছরে অন্তত একবার তাদের নিকটস্হ কারখানা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের ব্যবস্হা করা হবে।

৩. কম্পিউটার ব্যবহারসহ সহজলভ্য সকল তথ্যপ্রযুক্তির বাণিজ্য বিষয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হবে। এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলেজে প্রত্যেক ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে কম্পিউটার ল্যাবরেটরি স্থাপন করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীরা এগুলো ব্যবহার করবে, সেই জন্য তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৪. ব্যবসায় শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করতে হবে এবং এই লক্ষ্যে ব্যবসায় শিক্ষা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন উৎসাহিত করা হবে।

৫. বাণিজ্য অনুষদের শিক্ষকদের শিল্প, ব্যাংক, বীমা ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত সমস্যা নিয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬. শিক্ষকদের এমফিল পিএইচডি সংক্রান্ত গবেষণার কাজ পরিচালনায় উৎসাহ প্রদানের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রেষণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭. ব্যবসায় শিক্ষার সকল স্তরে শিল্প, বাণিজ্য ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত রীতি পদ্ধতি ও সম্ভাব্য উন্নয়ন চাহিদার আলোকে পাঠ্যসূচি নির্ধারণ ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করতে হবে। বিভিন্ন স্তরের জন্য স্তর-ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করার ব্যবস্থা করা হবে।

৮. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের তত্ত্বাবধানে বাস্তবতা ও চাহিদার আলোকে প্রণীত হবে।

৯. বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং শিল্প-ব্যবসায়ের মধ্যে মত বিনিময়ের সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং ব্যবস্থাপক প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে একটি প্রাতিষ্ঠানিক মতবিনিময় ব্যবস্থা তৈরি করা যেতে পারে।

১০. স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য শিল্প, বাণিজ্য ও সেবা খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার্থীদের স্বল্পমেয়াদী 'ইন্টার্নশিপ' এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক করা হবে।

১১. জাতীয় পর্যায়ে ব্যবসায় বিষয়ক শিক্ষার গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় পরিকল্পনায় ও সম্পদ বন্টনে এ খাতকে একটি অগ্রাধিকার খাত হিসেবে গণ্য করতে হবে।

১২. দেশের ১৬টি কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউট-এর ভৌত অবকাঠামো আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করলে ব্যবসায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখতে পারবে।

১৪ কৃষি শিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। তাই উন্নয়ন এবং আর্থ-সামাজিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন কৃষি উন্নয়ন ও বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত। কৃষি প্রধান বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন কৃষিশিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ ব্যবস্হার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। কৃষি একটি ফলিত বিজ্ঞান। কৃষি উন্নয়ন বলতে বোঝায় দেশের শস্য, পশুসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও বনসম্পদের পরিকল্পিত উন্নয়ন ও ব্যবস্হাপনা। উচ্চতর কৃষিশিক্ষা বলতে পরিকল্পিত উন্নয়ন ও ব্যবস্হাপনা, কৃষি, ভেটেরিনারি, পশুপালন, কৃষি প্রকৌশল, কৃষি অর্থনীতি ও মৎস্য বিজ্ঞানে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও ডক্টরাল পর্যায়ে অধ্যয়ন ও উচ্চতর গবেষণা বোঝায়। কৃষি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

দেশের মাটি, পানি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং দেশের পরিবেশগত শক্তি ও সম্ভাবনার বিকাশ সাধন।

- জাতীয় উন্নয়নে কৃষি নির্ভর আর্থ-সামাজিক অবস্হার উন্নয়ন।
- বিজ্ঞান ও যান্ত্রিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার দ্বারা কৃষি অর্থনীতির যথাযথ বিকাশ।
- পেশা ও বিজ্ঞান হিসেবে জাতীয় জীবনে কৃষির গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা ও প্রসার।
- প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করে দেশের স্হলজ ও জলজ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।
- কৃষি শিক্ষার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্হানে উদ্বুদ্ধকরণ।
- জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য ব্যাপক অভিঘাত মোকাবেলা করে কৃষি উন্নয়ন অব্যাহত রাখার জন্য জোরদার গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ।
- কৃষিকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি হিসেবে উপলব্ধি করার জন্য সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও সচেতনতা সৃষ্টি।
- কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টি।
- খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, অপুষ্টি দূরীকরণ ও দারিদ্র্যবিমোচন।
- গ্রামীণ কর্মসংস্হান সম্প্রসারণ।

কৌশল

১. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষিবিজ্ঞানে পাঠদান বাস্তবধর্মী ও বস্তুনিষ্ঠ এবং শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে জোরদার ও আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ভেটেরিনারি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, পশুসম্পদ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানে অধিকতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্হা গ্রহণ করতে হবে।

২. স্নাতক পর্যায়ের সকল শিক্ষাক্রমে যুক্তিযুক্ত উপায়ে সংশ্লিষ্ট বাধ্যতামূলক বিষয়, ঐচ্ছিক বিষয়, মাঠ ও গ্রামীণ কর্ম-অভিজ্ঞতা, সমাজবিজ্ঞান, ভাষা ও মৌল বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রাখা হবে। ব্যবহারিক শিক্ষার উপর যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে।

৩. বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি কলেজগুলোতে চার বছর মেয়াদি স্নাতক কোর্স পদ্ধতি প্রবর্তন করা হবে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ডিভিএম (ডিপ্লোমা ইন ভেটেরিনারি মেডিসিন) এর ক্ষেত্রে দুই সেমিস্টারের জন্য এবং অন্যান্য ডিগ্রির ক্ষেত্রে এক সেমিস্টারের জন্য ইন্টার্নীশিপ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. উচ্চতর কৃষি শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় ডিগ্রি কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা হবে বিজ্ঞান বিভাগে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত ও জীববিদ্যাসহ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। তবে কৃষিবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিদ্যা এবং গণিতসহ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা শুধু কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদে ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হবেন।

৫. কোর্স পদ্ধতি নির্দিষ্ট সময়সীমায় আবদ্ধ বলে এর সার্বিক সাফল্য শিক্ষকের বিষয়ের জ্ঞান, দক্ষতা, আন্তরিকতা ও নিবেদিতপ্রাণতার ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। এ কারণে দক্ষ ও মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরিসহ তাদের অনুকূলে উৎসাহ বিধানের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং তাদের জন্য উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণসহ জ্ঞানের আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া জোরদার করতে হবে।

৬. শিক্ষকদের শিক্ষাদান ও গবেষণাসহ অন্যান্য দায়-দায়িত্ব পালনের মূল্যায়ন প্রথা চালু করতে হবে।

৭. দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ১০০ নম্বর/৩ ক্রেডিট ইংরেজী বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৮. বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন সেমিস্টারব্যাপী কোর্স পদ্ধতির এমএস কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে এবং ডক্টরাল কার্যক্রমে গবেষণা ছাড়াও কোর্স-ওয়ার্ক অন্তর্ভুক্তি করা হবে।

৯. এছাড়া গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা যায়।

১০. উন্নত বীজ, জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি এবং বায়ো-টেকনলজি সংক্রান্ত গবেষণা জোরদার করার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১১. বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও জাতীয় উন্নয়ন চাহিদার সঙ্গে উচ্চতর কৃষিশিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলার জন্য প্রচলিত সংশ্লিষ্ট কোর্সসমূহের পাশাপাশি নতুন নতুন কোর্স সংযোজনের ব্যবস্থা করতে হবে (যেমন পরিবেশ বিজ্ঞান, জৈব প্রযুক্তি, জেনেটিক ইনজিনিয়ারিং, সম্পদ অর্থনীতি, জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা, ভূমিসত্ত্ব ও ব্যবস্থাপনা, পুষ্টিবিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞান প্রভৃতি)।

১২. বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যমান ভূমি ও অন্যান্য সম্পদের অধিকতর কার্যকর ব্যবস্থার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপযোগী নতুন নতুন এ্যাকশন গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়।

১৩. কম্পিউটার বিজ্ঞান শিক্ষা স্নাতক পর্যায়ে সবার জন্য বাধ্যতামূলক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিশেষায়িত কম্পিউটার সংক্রান্ত কোর্স ঐচ্ছিক করতে হবে।

১৪. উচ্চতর কৃষিশিক্ষার মান ও সমরূপতা বজায় রাখার জন্য টেক্‌নিক্যাল পর্যায়ে একটি সমন্বয়, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এই লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিতে পারে।

১৫ আইন শিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

আইনের আশ্রয় লাভ এবং আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভের অধিকার বাংলাদেশের সকল নাগরিকের এবং বাংলাদেশে অবস্থানকারী সকল ব্যক্তির সাংবিধানিক অধিকার। সংবিধান অনুযায়ী আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা ও দায়িত্বশীল নাগরিক সৃষ্টির জন্য আইনশিক্ষার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। দেশে ন্যায়বিচার, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যের জন্যও সঠিক ও যুগোপযোগী আইনশিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। আইন শিক্ষার দুটি দিক রয়েছে; পেশাগত ও ব্যবহারিক। দেশের প্রচলিত আইনশিক্ষায় এ দুটি দিকের কোনটারই সুষ্ঠু বিকাশ লক্ষ্য করা যাচেছ না। আইনশিক্ষার মান যেমন নানা কারণে নিম্নমুখী হচেছ তেমনি ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও এর কল্যাণকর ফলাফল সব সময় লক্ষিত হচেছ না। তাই আইন শিক্ষার সার্বিক পুনর্বিন্যাস ও আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আইন শিক্ষার্থীরা যাতে আইনের শাসন, মানবাধিকার ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে এবং দেশের অভ্যন্তরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থ সমুন্নত রাখতে পারে সে লক্ষ্যে আইন শিক্ষাকে অধিকতর বিশ্লেষণধর্মী ও প্রয়োগমুখী করতে হবে। আইন শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ ঃ

- জনগণের আইনগত অধিকার সংরক্ষণে সহায়তা করা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুদক্ষ শিক্ষক, আইনজীবী, আইনবিদ ও বিচারক তৈরিতে সাহায্য করা।
- এমন উচচ যোগ্যতা, উন্নত চরিত্র, ধীশক্তি ও জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি সৃষ্টি করা যারা-
  - আইনের শাসন ও ন্যায়বিচারের আদর্শ সমুন্নত রাখতে সক্ষম হবেন।
  - দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের জ্ঞানভান্ডার সমৃদ্ধ করে তুলতে পারবেন।
  - পেশাগত দক্ষতা ও নৈতিকতার আদর্শ স্থাপন করবেন।
  - আইন ও বিচার পদ্ধতির সংস্কার ও উন্নতি সাধন করতে পারবেন।
  - পরিবর্তনশীল সমাজের নতুন নতুন প্রয়োজনের সঙ্গে আইনশিক্ষা ও তার ব্যবহারিক অনুশীলনের সামঞ্জস্য বিধান করতে পারবেন।

কৌশল

১. আইন শিক্ষায় ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা হিসেবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষায় কমপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগ বা গ্রেড পদ্ধতিতে এর সমমান থাকতে হবে।

২. আইনে অনার্স ডিগ্রি কোর্স চার বছর মেয়াদি হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শুধু চার বছর মেয়াদি ডিগ্রি কোর্স পড়ানো হবে। কলেজগুলোতে সাধারণ এলএলবি কোর্সের মেয়াদ দু বছরের পরিবর্তে তিন বছর করা হবে এবং অনার্স-এর জন্য কোর্স হবে চার বছরের। ক্রমান্বয়ে তিন বছরের এলএলবি কোর্স উঠিয়ে দিয়ে তার স্থলে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চার বছরের আইনে অনার্স ডিগ্রি কোর্স চালু করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী হবে এক ও অভিন্ন।

৩. আইন শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রির জন্য অধ্যয়ন এবং আইন বিষয়ে গবেষণা উৎসাহিত করা হবে। এর জন্য আগামী ৪ বছরের মধ্যে আইন বিষয়ে অন্তত **একটি সেন্টার অফ এক্সেলেন্স** স্থাপন করতে হবে।

৪. আইন শিক্ষায় মাস্টার্স ডিগ্রি কোর্সের মেয়াদ হবে দু বছরের। মাস্টার্স ডিগ্রি কোর্স দুভাবে বিভক্ত হবে। যারা প্রথম অংশে কোর্স কার্যক্রম ও দ্বিতীয় অংশে থিসিস কার্যক্রমে যোগদান করে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হবে তাদের এমফিল ডিগ্রি প্রদান করা হবে। পিএইচডি ডিগ্রির ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধিসমূহ এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

৫. আইনশিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য আইন কলেজগুলোর ভৌত সুবিধা, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে।

৬. আইন কলেজ অনুমোদনের ব্যাপারে কলেজ ভবন, পাঠাগার, শিক্ষক নিয়োগ, কলেজের প্রশাসন, পরিচালন ও গভর্ণিং বডি গঠন ইত্যাদি ব্যাপারে সাধারণ কলেজসমূহের ক্ষেত্রে আরোপিত শর্তাদি আইন কলেজের ক্ষেত্রেও কঠোরভাবে প্রয়োগ ও বলবৎ করতে হবে। এ ব্যাপারে আইনানুযায়ী বাংলাদেশ বার কাউন্সিল-এর নিয়ামক এবং নিয়ন্ত্রক ভূমিকা মুখ্য হবে।

৭. বর্তমানে আইন কলেজসমূহে খন্ডকালীন শিক্ষক ও খন্ডকালীন ছাত্র-ছাত্রী এবং সান্ধ্যকালীন কোর্স ও ক্লাস সব মিলিয়ে যে খন্ডকালীন শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তার মানোন্নয়ন করা প্রয়োজন। এগুলোতে পূর্ণ শিক্ষাক্রম অনুসরণ করতে হবে।

৮. আইন কলেজগুলোতে মোট শিক্ষকের কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ নিয়মিত ও পূর্ণকালীন হতে হবে। অনধিক এক-তৃতীয়াংশ খন্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা থাকতে পারে।

১৬ নারীশিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

দেশ ও সমাজ উন্নয়নের মূল ভিত্তি শিক্ষা। সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক নানা কারণে এ দেশের সর্বস্তরে ব্যাপক সংখ্যক নারী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী । নারী শিক্ষাকে শুধু পরিবারের মঙ্গল, শিশুযত্ন ও ঘরকন্নার কাজে সীমাবদ্ধ রেখে জাতীয় উন্নয়নে নিষ্ক্রিয় রাখার সমাজে বিরাজমান প্রবণতা দূর করতে হবে। নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নারী শিক্ষার উপর জোর দিতে হবে।

নারী শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ

- নারীকে সচেতন ও প্রত্যয়ী করা, এবং সম-অধিকারের অনুকূলে নারীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রখর করা।
- সকল পর্যায়ে দেশ পরিচালনায় অংশগ্রহণে নারীকে উদ্বুদ্ধ ও দক্ষ করা।
- দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ও দারিদ্র্য বিমোচনে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও পর্যায়ে কাজে নিয়োজিত হয়ে এবং আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি সাধনে অবদান রাখা।
- যৌতুক ও নারী নির্যাতন এবং নারীর সমঅধিকার নিশ্চিত করার প্রক্রিয়ায় বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে পারেন এমন দৃষ্টিভঙ্গি ও আত্মপ্রত্যয় নারীর মধ্যে সৃষ্টি করা।

কৌশল

১. বাজেটে নারীশিক্ষা খাতে নির্দিষ্ট বরাদ্দ দিতে হবে। শিক্ষার সকল স্তরে নারীশিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য বিশেষ তহবিল গঠন করতে হবে এবং বেসরকারি উদ্যোগ ও অর্থায়নকে উৎসাহিত করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

২. ছাত্রীদের বিদ্যালয় ত্যাগের হার কমানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং ঝরেপড়া ছাত্রীদের মূলধারায় ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপ নিতে হবে। যাদেরকে এভাবে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবেনা তাদেরকে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কর্মসূচির আওতায় আনতে হবে।

৩. ছাত্রীদের জন্য খন্ডকালীন, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার প্রতি নজর দিতে হবে।

৪. অধিক সংখ্যক মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় আনতে হবে এবং তাদের প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা/পেশাদারি শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে এবং এ বিষয়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৫. প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে পাঠ্যসূচিতে যথাযথ পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীর ইতিবাচক ও প্রগতিশীল ভাবমূর্তি ও সমান অধিকারের কথা তুলে ধরতে হবে এবং ইতিবাচক দিকগুলো পাঠ্যসূচিতে আনতে হবে, যাতে নারীর প্রতি সামাজিক আচরণের পরিবর্তন হয়।

৬. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচিতে আরও অধিক সংখ্যক মহীয়সী নারীর জীবনী ও নারীদের রচিত লেখা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৭. মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে "জেন্ডার স্টাডিজ" এবং প্রজনন-স্বাস্থ্য (reproductive health) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৮. মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বিষয় নির্বাচনে ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সকলের পুরো স্বাধীনতা থাকতে হবে এবং সকল বিষয়ের ওপর সমান গুরুত্ব দিতে হবে। মেয়েদের কোন বিশেষ বিষয়ের দিকে (যেমন গার্হস্থ্য অর্থনীতি) উৎসাহিত করা বা ঠেলে দেয়া যাবে না।

৯. মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম হওয়াতে ছাত্রীদের শিক্ষার সুবিধার্থে যাতায়াত সুবিধা ও হোস্টেলের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. মেয়েদেরকে বিজ্ঞানশিক্ষায় এবং পেশাদারিশিক্ষায় (যেমন - প্রকৌশল, মেডিকেল, আইন, ব্যবসায় ইত্যাদি) উৎসাহিত করতে হবে। মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষা খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

১১. দেশে মেয়েদের জন্য চারটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে আছে। যে সকল ছাত্রী মাধ্যমিক পর্যায়ে কোনো কারণে ভর্তি হতে পারে না বা উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী নয় তারা যাতে কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সেজন্য মেয়েদের জন্য পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আরও বাড়াতে হবে। প্রস্তাবিত উপজেলা কারিগরি বিদ্যালয়সমূহে মেয়েদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে হবে এবং তাদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১২. উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণা করার জন্য দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদের বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা এবং স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩. উচ্চশিক্ষা, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সকল নীতিনির্ধারণী ও সিদ্ধান্তগ্রহণ কার্যক্রমে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

১৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যে প্রণীত যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন সংক্রান্ত প্রণীত বিধিবিধান কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।

১৭ ললিতকলা শিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

একটি সংস্কৃতিবান, সুরুচিসম্পন্ন, ঐতিহ্য সচেতন সুশৃঙ্খল জাতি ও নাগরিকগোষ্ঠী সৃষ্টির জন্য ললিতকলা শিক্ষাদান অত্যন্ত জরুরি। ললিতকলার অন্তর্গত সংগীত, চিত্রকলা, কারুশিল্প ও নানাবিধ হাতের কাজ, আবৃত্তি, অভিনয়, নৃত্য ইত্যাদি বিষয় শিক্ষার্থীর মন ও মননকে বিকশিত করে, চিত্তবৃত্তিকে সমৃদ্ধ করে। ললিতকলা শিক্ষা শিক্ষার্থীর মনের সুকুমার বৃত্তিকে জাগ্রত করে, মন ও কর্মে শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টি করে, তাই পরিমিতিজ্ঞানসম্পন্ন, দক্ষ এবং সুনাগরিক গণগোষ্ঠী সৃষ্টিতে ললিতকলা শিক্ষা আবশ্যক। দেশের চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সংগীত, নাটক, যাত্রা ও থিয়েটার ইত্যাদি সম্পর্কে যেমন এর মাধ্যমে ধারণা লাভ করা যায়, তেমনি বিভিন্ন দেশের শিল্প সংস্কৃতি সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করা যায়। ললিতকলা শিক্ষার ফলে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ন্যায় বিদ্যালয়ত্যাগী শিক্ষার্থীদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে। ললিতকলা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য :

- শিক্ষার্থীদেরকে ললিতকলার একটি বা একাধিক শাখায় সুযোগ দিয়ে তাদের ঐসব বিষয়ে দক্ষ পেশাজীবী হয়ে উঠতে সহায়তা করা।

কৌশল

গ্রহণীয় পদক্ষেপগুলোর মধ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো অন্যতম।

১. ললিতকলা শিক্ষাদান বিষয়টিকে একটা পেশাভিত্তিক শিক্ষা হিসেবে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

২. সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসহ পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীসমূহের ছেলে-মেয়েদেরকে বিশেষ সহায়তা দেয়া হবে।

৩. ললিতকলা বিষয়টি সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে প্রবর্তন এবং এই দুইস্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে এর বিভিন্ন শাখায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ললিতকলা শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক, উপযুক্ত কক্ষ, পরিবেশ, পাঠ্যপুস্তক/সহায়ক পুস্তক ও বিভিন্ন সরঞ্জামের সংস্থান করতে হবে।

৫. ললিত কলার বিভিন্ন শাখায় উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে।

৬. সরকারি উদ্যোগে ও অর্থানুকূল্যে জাতীয় চিত্রশালা, সংগীত ও নৃত্য অ্যাকাডেমি, নাট্য ও রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করা বাঞ্ছনীয়।

৭. সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে শহর ও গ্রাম পর্যায়ে ভ্রাম্যমাণ চিত্রকলা ও কারুশিল্পের প্রদর্শনী, সংগীত, নাটক ও নৃত্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৮ বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা, স্কাউট ও গার্লস গাইড এবং ব্রতচারী

ক. প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা; প্রয়োজনে বিশেষ শিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

বিভিন্নভাবে সীমাবদ্ধতায় আক্রান্ত শিশুদের আওতায় পড়ে দৃষ্টি, শ্রবণ, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী। প্রতিবন্ধীত্বের মাত্রা অনুসারে এদের মৃদু প্রতিবন্ধী, মাঝারি প্রতিবন্ধী ও গুরুতর প্রতিবন্ধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রতিবন্ধীত্বের ধরণ ও মাত্রার ওপর নির্ভর করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্হার মাধ্যমে তাদেরকে বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা কার্যক্রমের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করা হবে, তবে প্রতিবন্ধীত্বের গুরুতর মাত্রার কারণে যাদেরকে এভাবে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হবে না তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্হা করতে হবে। এক্ষেত্রে নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।

বিশেষ শিক্ষার উদ্দেশ্য

- প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার মূলধারায় সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ।
- যে সব শিশু শারীরিক ও মানসিক সমস্যার জন্য তাদের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা পূরণ করতে পারে না এবং যাদের অবস্হা এমন যে তাদেরকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করা সম্ভব নয় তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষা, দক্ষ প্রতিকারমূলক ব্যবস্হা, বিশেষ যত্ন ও পরিচর্যার ব্যবস্হা করা।

কৌশল

১. বাংলাদেশ প্রতিবন্ধীদের সঠিক সংখ্যা এবং তাদের প্রতিবন্ধীত্বের ধরণ ও মাত্রা ভিত্তিক বিভাজন নির্ণয় করার জন্য শনাক্তকরণ ও জরিপ চালাতে হবে।

২. প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর করা বাঞ্ছনীয়।

৩. প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রয়োজনানুসারে নির্ধারিত বিদ্যালয়সমূহে সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্হা চালু করতে হবে, যাতে স্বাভাবিক ছেলেমেয়েদের সঙ্গে প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের শিক্ষা গ্রহণ ব্যবস্হায় দ্রুত উন্নতি হয়।

৪. সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় স্কুলগুলোতে অন্তত একজন প্রশিক্ষিত বিশেষ শিক্ষার শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

৫. সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তরের অধীনে যে ৬৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে সেগুলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে স্হানান্তর করা এবং সেগুলোর উন্নতি করা প্রয়োজন। এ ব্যবস্হা শ্রবণ, বচন, মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য চালু করা বাঞ্ছনীয়।

৬. দৃষ্টি, শ্রবণ, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য জেলা ও থানা পর্যায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম খোলার ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. প্রতিবন্ধীদের বিভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজন অনুসারে বিশেষ শিক্ষার জন্য পৃথক পৃথক বিদ্যালয় স্হাপন করা প্রয়োজন।

৮. এক বা একাধিক বিষয় অধ্যয়নে অসমর্থ প্রতিবন্ধীদের জন্য বিকল্প শিক্ষাক্রম অনুসরণ করতে হবে।

৯. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ বিনামূল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০. প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমন্বিত শিক্ষাক্রম সম্বলিত সাধারণ বিদ্যালয়সমূহে এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ শিক্ষকদের জন্য পিটিআইগুলোতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়/ইনিস্টিটিউট স্থাপন করার পদক্ষেপ নিতে হবে।

১১. সাধারণ বিদ্যালয়সমূহে প্রস্তাবিত সমন্বিত শিক্ষা চালু করার লক্ষ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে বিশেষ শিক্ষা এবং প্রতিবন্ধীদের সম্পর্কিত বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এতে সাধারণ শ্রেণীতে শিক্ষকের পক্ষে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে গ্রহণ করা সহজতর হবে।

১২. প্রতিবন্ধীদের সম্পর্কে জ্ঞান ও সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষায় প্রাথমিক স্তর থেকে শিক্ষাক্রমে প্রতিবন্ধী সম্পর্কিত বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্ছনীয়।

১৩. চাকরির ক্ষেত্রে যোগ্য প্রতিবন্ধীদের সমান সুযোগ প্রদান করতে হবে। তারা কিছু বিশেষ বিবেচনারও দাবি রাখে।

খ. স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে সম্ভবত সবচেয়ে অবহেলিত অংশ স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা। শিক্ষিত জাতি গঠণে সাধারণ শিক্ষার মতো স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। এ দুটোকে বাদ দিলে সাধারণ শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ বলা যাবে না।

শিশুকাল থেকে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে শিক্ষার্থীদের শারীরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার উদ্যোগ নেওয়া হলে তারা তাদের শরীর ব্যায়ামের মাধ্যমে সুস্থ থাকার দিকে মনোযোগী হবে। দ্বিতীয়ত তারা নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা শিখতে শুরু করবে। সময়ানুবর্তিতা শারীরিক শিক্ষার অন্যতম পাঠ। তৃতীয়ত শারীরিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশ শুরু হবে। এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতে পারে বরেণ্য খেলোয়াড়। প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকা জরুরি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি শরীরচর্চা ও খেলাধুলার পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা থাকে তাহলে বয়ঃসন্ধিক্ষণে ছেলেমেয়েদের বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কাও কম থাকে। উপযুক্ত খেলাধুলার পরিবেশ পেলে মাদক দ্রব্যের মত ভয়াল অভিশাপ শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে পারবে না।

- শরীরচর্চা ও খেলাধুলা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে একটি আবশ্যিক বিষয় করা হবে।
- কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীরিক শিক্ষা উৎসাহিত করা হবে।

কৌশল

১. শিক্ষার কোনো পর্যায়ে বিষয়টি পাবলিক পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। তবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার যোগ্যতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে একটি নির্ধারিত মান অর্জন করতে হবে যা ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে নির্ণয় করতে হবে। প্রত্যেক শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বয়স ও সামর্থ্য বিবেচনা করে শারীরিক শিক্ষা বিষয়ক পাঠ্যসূচিকে যুগোপযোগী, আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত করতে হবে।

২. শরীর চর্চা বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক শিক্ষা দিতে হবে।

৩. নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনের সময় খেলার মাঠ থাকা একটি অপরিহার্য শর্ত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৪. স্বল্পমূল্যে স্কুল কলেজে শারীরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করতে হবে।

৫. দেশীয় খেলাধুলার প্রচলন করতে হবে, বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে।

৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধুলার জন্য বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

৭. প্রতিবন্ধীদের শরীরচর্চা ও খেলাধুলা তদারকির জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষক থাকা বাঞ্ছনীয়।

খ. স্কাউট, গার্লস গাইড ও বিএনসিসি

স্কাউট কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

- দেশের শিশু, কিশোর কিশোরী ও তরুণ তরুণীদের যথাক্রমে স্কাউট ও গার্লগাইড প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, আত্মনির্ভরশীল, সৎ, চরিত্রবান, কর্মোদ্যোগী, সেবাপরায়ণ, স্বাস্থ্য সচেতন, সর্বোপরি আদর্শ সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে অবদান রাখা।
- স্কাউট ও গার্লগাইড কর্মসূচি অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তিসত্তার উন্মেষ ঘটিয়ে তরুণ তরুণীদের স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল, আত্মসচেতন ও পরোপকারী হিসেবে গড়ে ওঠার গুণাবলী অর্জনে সহায়তা দান করা।
- বিএনসিসি'র আওতায় অনুশীলনের মাধ্যমে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তি জীবনে কর্মদক্ষতা, নৈতিকতা ও শৃঙ্খলাবোধের উন্মেষ ঘটানো।

কৌশল

১. দেশের সর্বত্র (স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায়) স্কাউট আন্দোলন মোটামুটি বিস্তৃত। একে আরো বিস্তৃত ও সুসংহত করা প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে -

➢ দেশের সকল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাব স্কাউটিং এবং স্কাউটিং (থাকলে) জোরদার করতে হবে এবং (না থাকলে) চালু করতে হবে।

২. দেশের সর্বত্র বালিকা বিদ্যালয়ে গার্ল গাইড আন্দোলন মোটামুটি বিস্তৃত। একে আরো বিস্তৃত ও সুসংহত করা প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে -

➢ দেশের সকল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গার্ল স্কাউটিং এবং গার্ল গাইডিং (থাকলে) আরো জোরদার করতে হবে এবং (না থাকলে) চালু করতে হবে।

৩. শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহে কাব স্কাউট, স্কাউট, গার্ল স্কাউট ও গার্ল গাইড বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়।

৪. দেশের সকল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএনসিসি শাখা খোলা যেতে পারে।

গ. ব্রতচারী

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

অর্ন্তনিহিত উদ্দেশ্যের বিবেচনায় ব্রতচারী কার্যক্রম অনেকটা স্কাউটিং ও গার্লসগাইডিং-এর অনুরূপ, তবে এটি এই দেশের সংস্কৃতির ভেতর থেকে উঠে এসেছে। এটি গীত ও নৃত্য-ভিত্তিক সুশৃঙ্খল একটি কার্যক্রম যা বিদ্যালয়ে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান হিসেবেও বিবেচনা করা যায়। ব্রতচারীর উদ্দেশ্যসমূহকে (নিম্নে বর্ণিত) উপজীব্য করে ছড়া ও গীত-এর সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করা হয়। যারা তা পরিবেশ করেন এবং যারা শুনেন-দেখেন সবাইকে এই কার্যক্রম ব্রতচারীর উদ্দেশ্যসমূহের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে সহজেই। ব্রতচারী কার্যক্রম সিলেট, খুলনা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ এবং জয়পুরহাটের অনেক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রচলিত আছে। এর মূল উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- ব্রতচারীর শিক্ষা যোগ্য নাগরিক হওয়া, শ্রমজীবি মানুষকে সম্মান করা, অসম্প্রদায়িকতা অনুশীলন করা, পরিশ্রমী হওয়া, দেশ গড়ার কাজে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালানো এবং মানুষের সেবা করা।
- সেই লক্ষ্যে এই কার্যক্রম সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, পরিশ্রমী, পরোপকারে উদ্বুদ্ধ, সুস্থ মনের মানুষ সৃষ্টিতে নিবেদিত।

কৌশল

১. নীতিগতভাবে ব্রতচারী কার্যক্রমের স্বীকৃতি দেয়া।

২. যে সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এটি চালু আছে তার পদ্ধতি ও কার্যকারিতার মূল্যায়ন করা এবং এর একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করা।

৩. দেশের অন্যান্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এটি চালু করার জন্যে উৎসাহ দেয়া।

৪. সপ্তাহে দুই দিন একটি সুবিধাজনক সময়ে দিনে আধ ঘন্টা এর জন্য নির্ধারণ করা যেতে পারে।

৫. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ব্রতচারী সংগঠনের অনুরূপ শিশু-কিশোরদের অন্যান্য সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনায় উৎসাহ প্রদান করা যায়।

১৯ ক্রীড়াশিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

ছাত্র-ছাত্রীসহ তরুণ তরুণীদের পূর্ণ বিকাশে শরীরচর্চা ও ক্রীড়ার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, উৎপাদনশীলতা, সৃজনধর্মী এবং আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সুস্থ দেহ ও মনের সমন্বয় মানব উন্নয়নে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। শরীর, মন ও মেধার সমন্বয়ে মানুষের জীবন পূর্ণতা লাভ করে। বাংলাদেশে খেলাধুলা ও শরীর চর্চা দীর্ঘদিন ধরে বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকলেও দেশে প্রচলিত ক্রীড়া ও শরীর চর্চার মধ্য দিয়ে তা' কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা' প্রশ্ন সাপেক্ষ। উল্লেখ্য, বর্তমানে ক্রীড়া শিক্ষা ও এক্ষেত্রে দক্ষতা ও নৈপুণ্য অর্জনের বিষয়টি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ভারত, চীনসহ ইউরোপ, আমেরিকায় তা' উচ্চ শিক্ষার স্তরে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সম্প্রসারিত হয়েছে। এসব দেশের 'ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয়' মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। বিশ্বব্যাপী ক্রীড়াবিদ্যায় শিক্ষিত তরুণ তরুণীরা আজ আকর্ষণীয় পেশাগত সম্মানের অধিকারী। কিন্তু আমাদের দেশে ক্রীড়াবিদগণ বিশ্বপরিসরে বিভিন্ন ক্রীড়ায় এখনো কাঙ্খিত স্বীকৃতি পায়নি। যার ফলে বিভিন্ন সময়ে গৌরবজনক অর্জনের ধারাবাহিকতাও রক্ষা হয় না বলে দেখা যায়। এ প্রেক্ষিতে ক্রীড়া শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়ে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

ক্রীড়া শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ

- প্রশিক্ষিত ক্রীড়াবিদ তৈরী করতে সহায়তা করা। ক্রীড়া শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়াবিদ তৈরী করা।
- প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করে আমাদের ক্রীড়াবিদদের জন্য দেশ ও বিদেশে উল্লেখযোগ্য পেশাদার ক্রীড়াবিদের তালিকায় স্থান পাওয়ার পথ সুগম করা।
- ক্রীড়া ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করে দেশের ভাবমূর্তি অর্জনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সহায়তা করা।
- ক্রীড়াকে পেশা হিসেবে গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা।
- দেশের সকল অঞ্চলের ছেলে-মেয়েরা যেন ক্রীড়া ক্ষেত্রে অবদান রাখার সমান সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করা।

কৌশল

স্মর্তব্য, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ক্রীড়া শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কারিকুলাম/সিলেবাসের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ক্রীড়া শিক্ষা প্রদান করছে। কিন্তু ঢাকার সাভারে বাংলাদেশের একমাত্র ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিকেএসপি বর্তমানে শিক্ষা বোর্ডের অধীনে প্রচলিত এসএসসি ও এইচএসসি পর্যায়ে এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রি স্তরে সনদ প্রদান করে আসছে। ক্রীড়া শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ রূপদান ও আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে এ কার্যক্রম যথেষ্ট নয়। দেশে মানসম্পন্ন ক্রীড়া শিক্ষা সম্প্রসারণে নিম্নোক্ত কৌশলসমূহ গ্রহণ করা যায় :

১. বাংলাদেশে ক্রীড়াশিক্ষাকে যুগোপযোগী করে আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়াবিদ তৈরীর লক্ষ্যে বাংলাদেশের একমাত্র ক্রীড়াশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিকেএসপি'কে একটি পূর্ণাঙ্গ ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করে জেলা পর্যায়ে ক্রীড়াশিক্ষা স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করে বিকেএসপি-র অধীনে ক্রীড়াশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত করা বাঞ্ছনীয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ৬ বিভাগীয় সদরে এবং পর্যায়ক্রমে ১৯ পুরাতন বৃহত্তর জেলাসদরে এবং সকল প্রশাসনিক জেলা সদরে তা চালু করা যেতে পারে।

২. সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে স্বতন্ত্র ক্রীড়াশিক্ষা স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। বিদেশের বিভিন্ন ক্রীড়াশিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের সিলেবাস/কারিকুলাম সম্পর্কে যথাযথ অবহিত হয়ে ও বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে, বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন জেলার স্বীকৃত ক্রীড়া সংস্থা, অভিজ্ঞ ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদীদের পরামর্শ নিয়ে বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ের ক্রীড়া শিক্ষা সিলেবাস/কারিকুলাম প্রণয়ন করা যেতে পারে।

২০ গ্রন্থাগার

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

গ্রন্থাগার সভ্যতার দর্পণ বলে বিবেচিত। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রন্থাগার যেমন একটি দেশের সার্বিক সাংস্কৃতিক বিকাশগত মান নির্ধারণের অন্যতম সূচক, তেমনি গ্রন্থাগারিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার পরিবেশ ও এর গুণগত মান ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রাণ স্পন্দনের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা দেশের নাগরিকদের জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ, গবেষণা, নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও শিক্ষা গ্রহণে গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমন্বয়ের মাধ্যমে জ্ঞান ও তথ্য সহজ লভ্য করার দায়িত্ব হল দেশে গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রগুলোর, এই প্রত্যয়কে ভিত্তি করে দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রিত জাতীয় লাইব্রেরী ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর লাইব্রেরী থেকে শুরু করে কলেজসমূহের লাইব্রেরী পর্যায়ক্রমে ডিজিটাল ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে এবং এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের পদক্ষেপ শুরু থেকেই নিতে হবে। মূল উদ্দেশ্য:

- সর্বস্তরে সুষ্ঠু, সমৃদ্ধ এবং পর্যায়ক্রমে ডিজিটাল ব্যবস্থার আওতায় আনা গ্রন্থাগার ও বই সরবরাহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

কৌশল

১. সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার স্থাপন করা হবে, তবে যতদিন সেটি পুরোপুরি বাস্তবায়িত না হবে ততদিন দেশের প্রত্যেকটি উপজেলা সদরে গণগ্রন্থাগার স্থাপন করতে হবে, যার একটি দায়িত্ব হবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বই সরবরাহ করা। এই গ্রন্থাগার শুধু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বই সরবরাহ করবে না বরং উপজেলায় অবস্থিত সকল পর্যায় ও ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এবং স্থানীয় মানুষের বই ও অন্যান্য শিক্ষা সামগ্রীর উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। উপজেলা-ভিত্তিক গ্রন্থাগারগুলোকে পর্যায়ক্রমে ডিজিটাল ব্যবস্থার আওতায় আনা হবে।

২. প্রত্যেক ইউনিয়নে এক বা একাধিক নির্বাচিত প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ভ্রাম্যমান বইয়ের কেন্দ্র রূপে দাঁড় করাতে হবে এবং এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। পরবর্তীতে উপজেলা গ্রন্থাগারের অনুরূপ গ্রন্থাগার ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে যথাযথ বেসরকারী উদ্যোগ উৎসাহিত করা যায়।

৩. পিটিআই, নেপ এবং অধিদপ্তরসমূহের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারগুলোর আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

৪. মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজে উন্নত ও আধুনিক মানের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা, গ্রন্থাগারিক-এর পদ সৃষ্টি এবং গ্রন্থগার কর্মীদের বেতন কাঠামো বিভিন্ন স্তরে যৌক্তিকীকরণ উন্নীত করা জরুরি। সরকার কর্তৃক গ্রন্থাগারের জন্য বার্ষিক মঞ্জুরি দিতে হবে। প্রস্তাবিত উপজেলা গ্রন্থাগার থেকেও এসকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উপকৃত হবে।

৫. বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করতে হবে এবং গবেষণা কাজে সহায়তার জন্য গ্রন্থ ও সাময়িকী ক্রয়ের জন্য ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। এই গ্রন্থাগারগুলোকে ডিজিটাল ব্যবস্থার আওতায় আনার পদক্ষেপ নেয়া হবে।

৬. জাতীয় গ্রন্থাগার ও জাতীয় আর্কাইভসের গুরুত্ব বিবেচনা করে এগুলোর সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস করতে হবে এবং ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় আনতে হবে। জাতীয় গ্রন্থাগারে একটি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ শাখা থাকবে এবং এই শাখাকে তথ্যপ্রযুক্তি দিয়ে সমৃদ্ধ করতে হবে।

৭. বিভাগীয় শহর ও জেলা সদরসমূহে পর্যায়ক্রমে জাতীয় গণগ্রন্থাগার স্থাপন করার পদক্ষেপ নেয়া হবে। স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ শহরগুলোতে নগর গ্রন্থাগার ও পৌর গ্রন্থাগার স্থাপন করবে।

৮. নীতি, পরিকল্পনা ও সমন্বয়গত সমস্যার সমাধান ও উন্নয়নের জন্য একটি সংবিধিবদ্ধ যথাযথ মর্যাদাসম্পন্ন কার্যকর গ্রন্থাগার কাউন্সিল স্থাপন করা দরকার।

৯. মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরকে নিজ নিজ প্রশাসনাধীন গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রগুলোর উন্নয়ন ও নতুন গ্রন্থাগার স্থাপনায় কাউন্সিলের পরামর্শ অনুযায়ী নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

২১ পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন একটি বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা যার সাহায্যে শিক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্য অর্জনে শিক্ষার্থী কতটা সফল হয়েছে তা নিরূপিত হয়। শিক্ষার্থীর আচরণের যে দিকগুলো তার সার্বিক ব্যক্তিত্ব বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে শিক্ষাবিদগণ চিহ্নিত করেছেন সেগুলো হলো- জ্ঞানার্জন সম্পর্কিত, অনুভূতি সম্পর্কিত ও মনন সম্পর্কিত ঃ

- এই তিন প্রকার আচরণের মধ্যে আমাদের দেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথমটি মূল্যায়ন করা হয়। এটি আরো কার্য্যকরভাবে মূল্যায়ন করার ব্যবস্হা করা যেতে পারে।
- এছাড়া মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর অন্য দুটি দিকও যাচাই করতে হবে। তবে এগুলো বার্ষিক, প্রান্তিক বা পাবলিক পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা যাবে না; এগুলোকে ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়ন করতে হবে এবং এই মূল্যায়নে একটি ন্যূনতম মান অর্জন না করতে পারলে বার্ষিক বা পাবলিক পরীক্ষা দিতে না দেওয়ার ব্যবস্হা গ্রহণ করা যায়, তবে এ ক্ষেত্রে নিয়মনীতি তৈরী করতে হবে।

কৌশল

১. শিক্ষার সকল স্তরে জ্ঞান-অর্জন মূল্যায়ন যাতে যথার্থ হয় সে দিকে যথাযথ নজর দিতে হবে। পরীক্ষা পদ্ধতিকে আরো কার্যকর করা হবে।

২. ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার্থীদের অনুভূতি ও মনন সম্পর্কিত বিকাশ মূল্যায়ন করার পদ্ধতি নিরূপন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্য্যক্রম হাতে নেয়া হবে।

৩. প্রচলিত পদ্ধতিতে মূলত মুখস্হ করা বিদ্যা মূল্যায়িত হয়। এটি প্রকৃত মূল্যায়ন হতে পারে না। আসলে মুখস্হ বিদ্যা নয় বরং বিষয়বস্তুকে কতটুকু আত্মস্হ করা হয়েছে তার মূল্যায়ন করা গেলেই শিক্ষার প্রকৃত মূল্যায়ণ করা হবে। বর্তমানে যে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করা হচেছ সেটি আত্মস্হ করা বিদ্যা মূল্যায়নের একটি প্রক্রিয়া। এই পদ্ধতির কার্যকর প্রয়োগ নির্ভর করবে সঠিক পাঠ্যপুস্তক, প্রশ্ন করার নিয়ম-কানুন উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিল রেখে নির্ধারণ করা এবং প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তা যথাযথভাবে বুঝতে পারার ওপর। কাজেই এ বিষয়ে যথাযথ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, নিয়ম-কানুন নির্ধারণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা ও জ্ঞান সৃষ্টি করার কার্যকর ব্যবস্হা গ্রহণ জরুরি।

৪. স্কুল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক মূল্যায়ন পদ্ধতি অব্যাহত থাকবে। সকল শ্রেণীতে কার্যকরভাবে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করতে হবে। খেলাধুলা ও শরীরচর্চা ধারাবাহিক মূল্যায়নে স্থান পাবে।

৫. পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা উপজেলা/পৌরসভা/থানা (বড় বড় শহরে, যেমন ঢাকায়) পর্যায়ে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। এই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি, পরীক্ষা-তদারকি এবং উত্তরপত্র মূল্যায়নসহ সকল ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান স্থানীয় সমাজ-ভিত্তিক শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রক্রিয়াকে সম্পৃক্ত করে ব্যবস্থা করতে পারে। এই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান করা হবে।

৬. অষ্টম শ্রেণী শেষে বিভাগ ভিত্তিক পাবলিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। এই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান করা হবে। এই পর্যায়ের প্রশ্নপত্র সাধারণত বিভাগ পর্যায়ে সমন্বয়ের মাধ্যমে করা হবে এবং সেই প্রশ্নপত্র সংশ্লিষ্ট বিভাগের সর্বত্র ব্যবহার করা হবে।

৭. সমাজ সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৮ম শ্রেণীর প্রাক-পাবলিক পরীক্ষা এবং এসএসসি পরীক্ষা থাকা পর্যন্ত এসএসসির, টেস্ট পরীক্ষা উপজেলা/পৌরসভা/থানা (বড় শহরে) পর্যায়ে স্থানীয় সমাজভিত্তিক ব্যবস্থা (অধ্যায়-২, কৌশল) এবং স্থানীয় সরকারের যৌথ ব্যবস্থাপনায় অভিন্ন প্রশ্ন পত্রের (জেলা শিক্ষা অফিস দ্বারা অথবা উপজেলা পর্যায়ে বিশেষ ব্যবস্থায় প্রণীত) মাধ্যমে গ্রহণ করা যায়।

৮. যে সকল শিক্ষার্থী অষ্টম শ্রেণীর শেষে পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে না, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের একটি কোর্স সমাপ্তি সনদপত্র প্রদান করবে এবং শিক্ষার্থীর অন্তঃপরীক্ষা ও ধারাবাহিক মূল্যায়নের ফলাফল জন্ম তারিখসহ উক্ত সনদপত্রে লিপিবদ্ধ থাকবে।

৯. ৯ম শ্রেণী থেকে প্রমোশন অন্তঃপরীক্ষার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে এবং মাধ্যমিক স্তরে চূড়ান্ত পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে দ্বাদশ শ্রেণী শেষে।

১০. দশম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা উপজেলা/পৌরসভা/থানা (বড় বড় শহরে, যেমন ঢাকায়) পর্যায়ে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। এই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি, পরীক্ষা-তদারকি এবং উত্তরপত্র মূল্যায়নসহ সকল ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান স্থানীয় সমাজ-ভিত্তিক শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রক্রিয়াকে সম্পৃক্ত করে ব্যবস্থা করতে পারে। এই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান করা হবে।

১১. মাধ্যমিক পর্যায়ে ব্যবহারিক পরীক্ষার যথাযথ মূল্যায়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১২. মাধ্যমিক পর্যায়ের পাবলিক পরীক্ষায় কোন ছাত্র/ছাত্রী এক বা দুই বিষয়ে অকৃতকার্য হলে তাকে সে বিষয়ে/বিষয় দু'টিতে দু'বার পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি পরিবর্তিত হলে পুরাতন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী উক্ত প্রার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে, তবে কোনো অন্তর্বর্তীকালীন পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যাবে না।

১৩. মাধ্যমিক ও ডিগ্রি পরীক্ষার কেন্দ্র উপজেলা সদরের নিচের পর্যায়ে হবে না; তবে শুধু মেয়েদের জন্য উপজেলার অন্যত্র হতে পারে।

১৪. কর্মদক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য এক বোর্ড থেকে অন্য বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বদলির ব্যবস্থা করতে হবে।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা

১৫. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থায় ধারাবাহিক মূল্যায়ন যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে, তাই কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষা

১৬. স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রয়োজনে অন্তঃ ও বহিঃমূল্যায়ন ব্যবস্থা থাকবে। মুখস্থ করাকে নিরুৎসাহিত করে আত্মস্থ করার জন্য শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মূল্যায়ন পদ্ধতি আধুনিকীকরণ করে যথাযথ মূল্যায়ন করবে।

১৭. পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতির মাঝে সামঞ্জস্য আনতে হবে।

১৮. ধারাবাহিক মূল্যায়ন, হোমওয়ার্ক, মিড টার্ম পরীক্ষায় আরো বেশী গুরুত্ব দিতে হবে।

১৯. বিভাগীয় কমিটি এবং ফ্যাকাল্টি ডিন পরীক্ষার মূল্যায়ন বিষয়টিকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখবেন।

২০. স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের গ্রেডিং এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে এক ও অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করতে হবে।

সকল স্তরে প্রযোজ্য

২১. প্রান্তিক ও পাবলিক পরীক্ষা সমূহের তারিখ অ্যাকাডেমিক বছর শুরু হওয়ার আগেই নির্ধারণ করতে হবে এবং তা অনুসরণ করতে হবে।

২২. প্রধান পরীক্ষক, পরীক্ষক ও প্রশ্ন পরিমার্জনাকারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

২৩. পরীক্ষকদের নিকট থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উত্তরপত্র পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান থাকবে, এবং যথাসময়ে উত্তরপত্র মূল্যায়নের ব্যর্থতার জন্য শাস্তির বিধান করতে হবে। উত্তরপত্রের সম্মানী যুগোপযোগী হতে হবে।

২৪. গাইড বই, নোট বই, প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং প্রভৃতির ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়া ও শিক্ষার মান অর্জন বিশেষ বিঘ্নিত হচ্ছে। এগুলো বন্ধ করার উদ্যোগ নিতে হবে। একদিকে যারা গাইড বই ও নোট বই তৈরি ও সরবরাহ করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন; এবং অন্যদিকে বিদ্যালয় ও কলেজে শিক্ষাদান আরো কার্যকর ও আকর্ষণীয় করার ব্যবস্থা করতে হবে। যে সকল শিক্ষক দায়িত্ব পালনে গাফিলতি করবেন তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। তাছাড়া গাইড বই, নোট বই ও কোচিং-এর অপকারিতা সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সচেতন করতে হবে।

২৫. পরীক্ষায় নকল প্রবণতা রোধ কল্পে শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপকদের আরো উদ্যোগী হতে হবে। এই বিষয়ে সময় সময় সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন করার, বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নকলের পরিণতি সম্বন্ধে সতর্ক করার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আলোচনা সভা ও প্রকাশনার আয়োজন করতে পারে। যারা নকল করবে এবং যারা সহায্য করবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

২২. গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করার পর মেধা তালিকা নেই। তবে স্নাতক (সাধারণ এবং অনার্স) পর্যায়ে যারা গড়ে সর্বোচ্চ গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হবে তাদেরকে 'মেধা সমাজ' (যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত ফাই বেটা কাপ্পার অনুরূপ) হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বিবেচনা করা যায়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরেও বিশেষ স্বীকৃতির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। গ্রেডিং পদ্ধতিতে উত্তরপত্র মূল্যায়ন আরো কার্য্যকর করার লক্ষ্যে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত।

(২২) শিক্ষার্থীকল্যাণ ও নির্দেশনা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

অনেক সময় বহু সমস্যার আবর্তে অনেক শিক্ষার্থী অত্যাচারিত, বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, ফলে অনেকের জীবন নষ্ট হয়। তাই ছাত্র নির্দেশনা ও পরামর্শদান কর্মসূচি কার্যকরভাবে প্রবর্তন করা বাঞ্ছনীয়। তা করা হলে বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার এবং শিক্ষার্থীদের সুরক্ষার পরিবেশ উন্নত করা যাবে এবং শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার্থীকল্যাণ ব্যবস্থা ও নির্দেশনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ

- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিবেশ উন্নয়নে এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নত পরিবেশ সৃষ্টির/অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা।
- ছেলে-মেয়ে, জাতিসত্তা, আর্থ-সামাজিক অবস্থান, শারীরিক-মানসিক সীমাবদ্ধতা নির্বিশেষে সবাই পূর্ণ মানবাধিকার সম্পন্ন মানুষ, এই বোধ শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে উজ্জীবিত করা।
- শিক্ষার সকল পর্যায়ের পাঠক্রমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা করা। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আরো ব্যাপক উন্নতমানের স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা করা/জোরদার করা।
- প্রয়োজন-নির্ধারণ পূর্বক শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষার্থীদেরকে সহায়তা প্রদান করা।
- শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ব্যয়ভার লাঘব করে ছাত্র-ছাত্রীদের অধ্যয়নে উৎসাহিত ও প্রয়োজনীয় ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা এবং পাঠ্যাতিরিক্ত কার্যক্রমের সুযোগ সৃষ্টি করা।

কৌশল

১. শিক্ষার্থী কল্যাণ এবং উপদেশ-সেবা সকল শিক্ষা স্তরে চালু/শক্তিশালী করতে হবে।

২. সর্বস্তরের শিক্ষক উপদেষ্টাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করা জরুরি।

৩. পাঠ্যাতিরিক্ত কার্যক্রমে (যথা খেলাধুলা, বিতর্ক, বই পড়া, রচনা প্রতিযোগিতা, ম্যাগাজিন প্রকাশনা ইত্যাদি) শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত ও সহায়তা করতে হবে।

৪. প্রাথমিক স্তরে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ চালু রাখা এবং মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে/ স্বল্পমূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তিদানের ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করতে হবে এবং উচ্চশিক্ষার জন্য সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৬. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের জন্য পুষ্টিকর দুপুরের খাবার এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রতিটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার সুযোগসহ সমৃদ্ধ চিকিৎসা কেন্দ্র থাকবে হবে।

৭. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়নে কাজ করার জন্য শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থী ব্যবস্থাপক ও স্থানীয় সমাজের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কর্মদল গঠন করা যেতে পারে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে।

৮. কর্তৃপক্ষের সাহায্য, নাগরিকদের দান, প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের অনুদান নিয়ে প্রতি শিক্ষায়তনে ছাত্রকল্যাণ তহবিল গঠন করে অভাবগ্রস্ত মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে হবে।

৯. যে সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তা নেই সে সকল এবং প্রতিটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছেলে-মেয়েদের জন্য পৃথক ব্যায়ামগার তৈরির পদক্ষেপ নিতে হবে। কোন স্তরে তা কি আকারের ও পর্যায়ের হবে তা একটি মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

১০. ছাত্র-ছাত্রীদের সার্বিক কল্যাণের স্বার্থে শিক্ষার্থী-রাজনীতির একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা জরুরী যার ভিত্তি হবে শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়।

১১. যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্দেশনা ও পরামর্শদান কর্মসূচি বিদ্যমান আছে সেগুলোকে আরও জোরদার করতে হবে। শিক্ষার্থীদের পরামর্শক-শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কার্যকর নির্দেশনা ও পরামর্শদান কর্মসূচি চালু করতে হবে।

১২. প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা জরুরি ভিত্তিতে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চালু করা এবং থাকলে তা অব্যাহত রাখা ও জোরদার করা হবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে সকল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নতমানের স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা এবং থাকলে তা অব্যাহত রাখা এবং মানোন্নয়নের পদক্ষেপ নেয়া হবে।

১৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে শিক্ষার্থীকল্যাণ কাজে পরামর্শক প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ ও সহায়তা দেওয়ার জন্য একটি জাতীয় শিক্ষার্থী কল্যাণ নির্দেশনা ও পরামর্শকেন্দ্র স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

২৩ শিক্ষার্থী ভর্তি

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

একজন শিক্ষার্থীকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্যে তাকে তার মেধা ও মননের উপযোগী একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ করে দেয়া প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর আঞ্চলিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তে তার মেধা এবং প্রবণতা যেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির মাপকাঠি হয় সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। ভালো স্কুলে ভর্তি করার জন্যে কোমলমতি শিশুদের নানারকম তথ্য দিয়ে ভারাক্রান্ত করে প্রথম শ্রেণীতেই বিষয়ভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার প্রবণতাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। প্রাথমিকোত্তর সকল পর্যায়ে ভর্তির জন্য নীতিমালা তৈরি করতে হবে এবং সেগুলো অনুসরণ করতে হবে।

কৌশল

১. প্রত্যেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় যথাযথ নীতিমালা নির্ধারণ করে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি নির্বাচনী পরীক্ষা গ্রহণ করবে। এতে ভাষা (বাংলা ও ইংরেজী) এবং বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন থাকবে। পূর্ববর্তী পাবলিক পরীক্ষায় অর্জিত ফলাফলকে ভর্তির ব্যাপারে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হবে এবং সেটি মূল্যায়নের বিধিমালা থাকতে হবে। ফলাফল প্রকাশের এক মাসের ভেতর ভর্তি পরীক্ষার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

২. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কলেজগুলোতে ভর্তির জন্য পূর্ববর্তী পাবলিক পরীক্ষাসমূহের ফলাফলের মূল্যায়ন বিধিযোতাবেক করতে হবে। পাশাপাশি নির্বাচনী পরীক্ষা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশনা ও তদারকির ভিত্তিতে নেওয়া যাবে। নির্বাচনী পরীক্ষায় ভাষা (বাংলা এবং ইংরেজী) এবং শিক্ষার্থীর নির্বাচিত বিষয় ভিত্তিক হবে।

৩. প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য নির্বাচনী পরীক্ষা থাকবে না। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পরবর্তী যে সকল শ্রেণীতে ভর্তির জন্য নির্বাচনী পরীক্ষার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার স্বার্থে কোড পদ্ধতি অবলম্বন করে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাসের শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত বিবেচনায় আনতে হবে। এই বিবেচনায় নির্ধারিত সংখ্যার অতিরিক্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা যাবে না।

২৪ শিক্ষক প্রশিক্ষণ

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

সুশিক্ষা ও মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মানসম্পন্ন শিক্ষক। শিক্ষকের গুনগত মান নিশ্চিত করার জন্য একদিকে প্রয়োজন বিজ্ঞানসম্মত ও স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করা, অন্যদিকে প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষক-শিক্ষা এবং চাহিদাভিত্তিক যুগপোযোগী পৌনঃপুনিক শিক্ষক প্রশিক্ষনের মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধন করা।

দেশে প্রচলিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্হা খুবই গতানুগতিক, অসম্পূর্ণ, সনদপত্র সর্বস্ব, তত্ত্বীয় বিদ্যাপ্রধান, ব্যবহারিক শিক্ষা অপুর্ণ, মুখস্থ বিদ্যার ওপর নির্ভরশীল এবং পুরনো পরীক্ষা পদ্ধতি অনুসারী। তাই আশানুরূপ ফললাভ হচেছ না। বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ১৪টি সরকারি প্রশিক্ষণ কলেজ, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্হাপনা একাডেমী (নায়েম), মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, উচচ মাধ্যমিক কলেজের শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের জন্য ৫টি এইচ,এস,টি,টি,আই এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন উচচতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জন্য একটি শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট রয়েছে। ১৪টি সরকারি প্রশিক্ষণ কলেজেই বিএড ডিগ্রি দেওয়া হয়। কয়েকটি প্রশিক্ষণ কলেজে এমএড ডিগ্রিও প্রদান করা হয়। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ও দূর শিক্ষণের মাধ্যমে প্রতি বছর বিএড ডিগ্রি প্রদান করছে। এছাড়া ১০৬ টি বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এগুলোতে ভৌতব্যবস্থা, প্রশিক্ষকের মান এবং প্রদত্ত প্রশিক্ষণ অনেক ক্ষেত্রে খুবই নিচুমানের।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য ৫৩টি সরকারি ও ২টি বেসরকারি প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট রয়েছে। এগুলোতে এক বছর মেয়াদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বর্তমানে যে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্হা রয়েছে তা অপ্রতুল, চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত এবং যুগোপযোগী নয়। তাই প্রশিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন করা প্রয়োজন। পাশাপাশি শিক্ষকদের শিক্ষাদানে দক্ষতা মূল্যায়নের ব্যবস্হা থাকা জরুরী।

শিক্ষক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ

- শিক্ষক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের শিখন-শিখানো কলাকৌশল সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা।
- শিক্ষকদের পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধি করা এবং সময়ের সাথে যুগোপযোগীকরণে সহায়তা দান।
- শিক্ষকদের মধ্যে ব্যাক্তিত্ব, উদ্ভাবনী শক্তি বৃদ্ধি এবং নেতৃত্বের গুনাবলী জাগ্রত করা।
- শিক্ষকদেরকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দেশের জরুরী সমস্যাগুলোর সাথে পরিচিত করা এবং তাদের সাথে সম্পৃক্ত করতে সাহায্য করা।
- শিক্ষকদের আচরনিক দক্ষতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করা এবং দুর্বলতার কারণ অনুসন্ধান করে প্রতিশোধন মূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা করা।

- শিক্ষণের জন্য আধুনিক উপকরণ ব্যবহার সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন এবং তা ব্যবহারে উৎসাহিত করা।
- নতুন নতুন শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে দক্ষতা ও কৌশল বৃদ্ধি করা।
- গবেষণা পত্র তৈরী ও প্রতিবেদন পেশের ক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব অর্জনে সহায়তা করা।
- সমাজের সকল ধর্ম, বর্ণ, জাতিসত্তা, আর্থ-সামাজিক শ্রেণীর শিক্ষার্থীকে সমান সুযোগ দিয়ে পাঠদানে উৎসাহিত করা।
- সমাজের সুবিধা বঞ্চিত ক্ষুদ্রজাতি সত্তা এবং প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের বিশেষ শিখন চাহিদা অনুসারে শিখন সেবা প্রদানের কলাকৌশল অর্জনে সহায়তা করা।
- সমস্যাদি বিশ্লেষণে দক্ষতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা বৃদ্ধি করা।
- তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় সকল স্তরের শিক্ষককে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করে উন্নত ও আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এর সর্বোচ্চ অনুশীলনে উৎসাহিত করা।
- দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতন থেকে কার্য সম্পাদনের জন্য শিক্ষকদেরকে উৎসাহিত করা।
- গবেষণা কাজে অংশগ্রহণের জন্য আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি এবং গবেষণা কাজে উৎসাহিত করা।

কৌশল

১. প্রস্তাবিত বেসরকারী শিক্ষক নির্বাচন ও উন্নয়ন কমিশন (অধ্যায়-২) প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং কলেজ পর্যায়ের শিক্ষকদের উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করবে। এই কমিশনের দায়িত্ব হবে সকল পর্যায়ের শিক্ষকদের নির্বাচন, তাদের পেশাগত উন্নয়ন এবং শিক্ষক-শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত সকল প্রতিষ্ঠানের পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, নিয়ন্ত্রন ও মানোন্নয়ন।

২. এই কমিশন প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং কলেজ পর্যায়ের শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের জন্য পৃথক পৃথক সমন্বিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করবে। এ কার্যক্রমের অধিনে প্রত্যেক শিক্ষকের নির্ধারিত সময় অন্তর সঞ্জিবনী প্রশিক্ষণের সুযোগ থাকবে। এসব প্রশিক্ষণে শিখন যোগ্যতা ধারাবাহিক ভাবে বিন্যস্ত থাকবে। তাছাড়া সময় সময় শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন বিষয়াদি সংযোজনের সুযোগ থাকবে। সমন্বিত পরিকল্পনার অধিনে স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট কর্তৃক পরিচালিত হবে।

৩. শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আধুনিকীকরণ করতে হবে।

৪. প্রশিক্ষকদের পরিবর্তিত নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রবর্তনের আগেই নিজ নিজ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্হা করতে হবে এবং এ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও ধারণা থাকতে হবে।

৫. নিয়োগের সাথে সাথে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের জন্য ২ মাসের বুনিয়াদী ও কলেজ শিক্ষকদের জন্য ৪ মাসের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্হা করতে হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের কাজে যোগদানের ২ বছরের মধ্যে যথাক্রমে সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন ও বিএড কোর্স সম্পন্ন করতে হবে।

৬. প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য প্রচলিত প্রারম্ভিক শিক্ষক শিক্ষা কার্যক্রম সি-ইন-এড পরিবর্তন করে নতুন কার্যক্রম প্রবর্তন করা হবে। এ কার্যক্রমের মেয়াদ এক বছর থেকে বৃদ্ধি করে ১৮ মাস করা প্রয়োজন। নতুন কার্যক্রম শিখন-শেখানো ও মূল্যায়নের আধুনিক কলা কৌশল সংযোজন করা জরুরি। ইনটার্নশিপ ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ব্যবহারিক পাঠদানের মেয়াদ দুই পর্যায়ে কমপক্ষে নয় মাস করা বাঞ্ছনীয়।

৭. সরকারি কলেজের শিক্ষকগণ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ প্রাপ্ত হন বিধায় তাদের একসাথে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ দান করা সম্ভব। এদের প্রশিক্ষণ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্হাপনা একাডেমী (নায়েম)-তে দেওয়া হচেছ এবং এটি চলমান থাকবে। পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক শিক্ষককে ৩ বছর অন্তর বিষয়ভিত্তিক সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের ব্যবস্হা করতে হবে। বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ বেগবান করার জন্য প্রত্যেক বিভাগে একটি করে আঞ্চলিকা শিক্ষা ব্যবস্হাপনা একাডেমী প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা নিতে হবে।

৮. শিক্ষা প্রশাসনে যোগ্য ও আত্মবিশ্বাসী কর্মকর্তা সৃষ্টির জন্য চাকুরীর মধ্য ও উচ্চ স্তরে ব্যপক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. বেসরকারী বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষকগণকে প্রস্তাবিত পৃথক কর্মকমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ দিয়ে একসাথে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়। এদের প্রশিক্ষণ এইচএসটিটিআই-তে হতে পারে। এইচএসটিটিআই-তে বর্তমানে প্রচলিত বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ জোরদার করতে হবে।

১০. প্রশিক্ষকদের মানোন্নয়নের জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্হা করতে হবে। প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষদের জন্যও বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্হা অব্যাহত রাখতে হবে।

১১. প্রশিক্ষণে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের ব্যাপক ব্যাবস্হা করা ও প্রশিক্ষণার্থীদের ভূমিকার উপযুক্ত মূল্যায়নের ব্যবস্হা রাখতে হবে।

১২. সকল শিক্ষক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হবে যাতে সকল একাডেমিক ষ্টাফ এর ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেকে যুগোপযোগী রাখতে পারেন।

১৩. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য নিবিড় পরিবিক্ষনের ব্যবস্হা থাকতে হবে। কোনো দুর্বলতা পরিলক্ষিত হলে তা বিশেষ ব্যবস্হায় দূর করার পদক্ষেপ নিতে হবে।

১৪. বিভিন্ন পর্য্যায়ের ও ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা, প্রতিবন্ধী, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক) ভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালনের উপযোগী দক্ষ শিক্ষক সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বিষয়বস্তুর তারতম্য থাকবে।

১৫. শিক্ষক সংগঠনগুলো তাদের কর্মকান্ড শুধু পেশাগত দাবি আদায়ের মধ্যে নিয়োজিত না রেখে শিক্ষকদের মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে।

১৬. বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে উৎসাহিত করা হবে।

১৭. প্রশিক্ষণার্থীদের আর্থিক মঞ্জুরি বাড়ানো এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

১৮. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরো বস্তুনিষ্ঠ ও কার্যকির এবং সার্বক্ষণিক প্রশিক্ষণের স্বার্থে প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসিক ব্যবস্হা করতে হবে।

২৫ শিক্ষকদের মর্যাদা, অধিকার, দায়িত্ব

বাস্তবতা ও দিকনির্দেশনা

প্রাথমিক স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত সর্বত্র শিক্ষকদের যথাযথ মর্যাদার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। মেধাবী ছাত্রদেরকে শিক্ষকতায় আগ্রহী এবং সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে সকল স্তরের শিক্ষকদের মর্যাদার বিষয় গভীরভাবে বিবেচনা পূর্বক পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন যাতে তারা যথাযথ মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা পেতে পারেন। একই সাথে শিক্ষকদের অধিকারের সঙ্গে তাদের দায়িত্বের সামঞ্জস্য থাকতে হবে। শিক্ষকদেরকে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে পাঠদানসহ তাদের বিভিন্ন কর্মকান্ড সম্পাদন করতে হবে। শিক্ষার পরিবেশ ও মান যাতে উন্নত হয় সেদিকে সংশ্লিষ্ট সকলের যথাযথ ভূমিকা রাখতে হবে।

কৌশল

১. সামাজিক বাস্তবতা সামনে রেখে সকল স্তরের ও ধারার শিক্ষকদের মর্যাদা ও সুযোগসুবিধা এবং দায়দায়িত্বের বিষয় গভীরভাবে বিবেচনা করে তা পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

- এ বিষয়টির দু'টি বিশেষ দিক রয়েছে ঃ বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা এবং গুরুত্বের ভিত্তিতে জাতীয় মর্যাদা বিন্যাসে অথবা সরকারী কর্মকর্তাদের স্তর বিন্যাসে শিক্ষকদের অবস্থান। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদমর্যাদা বাংলাদেশ সরকারের সচিবের পদমর্যাদার সমান করে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য পর্যায়ের ও কলেজের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের পদমর্যাদা নির্ধারণ করতে হবে। বি.সিএস শিক্ষা ক্যাডারের অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপকদের বেতন গ্রেড পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপকদের সমতুল্য করতে হবে । মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের ৮ নম্বর গ্রেডে এবং প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের ৯ম গ্রেডে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের যথাক্রমে ১০ ও ১১ গ্রেডে বেতন নির্ধারণ ও পদায়ন করার পদক্ষেপ নেয়া বাঞ্ছনীয়।

উপর্যুক্ত দু'টি বিষয়ে শিক্ষার সকল স্তরের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা সুপারিশ করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের প্রতিনিধিত্ব সংবলিত দু'টি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা হবে।

- অপরদিকে শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ জরুরি। তাদের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা মূল্যায়ণের অব্যাহত ব্যবস্থা থাকতে হবে।

২. মহিলা শিক্ষকদের চাকরিতে নিয়োগসহ কোনো ক্ষেত্রেই বৈষম্য রাখা হবে না। সমযোগ্যতাসম্পন্ন মহিলাদের বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৩. শিক্ষার সকল পর্যায়ে শিক্ষকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে জেষ্ঠ্যতা এবং শিক্ষার সকল পর্যায়ে তাদের শিক্ষকতার মান বিবেচনায় আনতে হবে। সেই জন্য শিক্ষকতার মান নির্ণয় করার পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে। গৃহীত প্রশিক্ষণও শিক্ষার সর্বস্তরে পদন্নোতির ক্ষেত্রে বিবেচনায় নিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে উন্নতমানের প্রকাশনা ও গবেষণা এবং গৃহীত প্রশিক্ষণ বিবেচনায় নেয়া অব্যাহত থাকবে।

৪. শিক্ষাক্ষেত্রে ও সমাজে বিশেষ অবদান, মৌলিক রচনা ও প্রকাশনার জন্য শিক্ষকদের সম্মানিত ও উৎসাহিত করতে হবে।

৫. শিক্ষক সংগঠনগুলোর উচিত শিক্ষকদের নৈতিক আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করা এবং এ নীতিমালা অনুসৃত হচেছ কিনা তা নিশ্চিত করা। এ ব্যাপারে সরকারও একটি উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে পারে।

৬. দায়িত্ব পালনকালে পরীক্ষায় নকল ও অসদুপায় অবলম্বন বন্ধ করতে গিয়ে শিক্ষকগণকে যাতে সন্ত্রাসী ও দুস্কৃতকারীদের হামলার মুখোমুখি হতে না হয় সেই লক্ষ্যে তাদের নিরাপত্তার যথাযথ ব্যবস্হা গ্রহণ করতে হবে।

৭. পেশাগত আচরণ বিধি লংঘনের দায়ে অভিযুক্ত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শাস্তিমূলক পদক্ষেপসমূহ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে এবং বিধিসম্মতভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

৮. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে ছুটির সময় ব্যতীত শিক্ষা সংক্রান্ত কাজের বাইরে অন্যান্য কাজে সম্পৃক্ত করা বাঞ্ছনীয় নয়।

৯. সরকারী, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের অন্যান্যদের মতো অর্জিত ছুটির ব্যবস্হা থাকবে।

২৬ শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

শিক্ষার মূল প্রাণবিন্দু শিক্ষাক্রম। তাই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটবে এটা যেমন প্রত্যাশিত, তেমনি শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষাক্রম প্রণীত হবে এটাও কাঙ্খিত। যেহেতু একটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্হা দেশের বিরাজমান আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্হা, দীর্ঘদিনের লালিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের ওপর গড়ে ওঠা বাঞ্ছনীয় তাই পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্হার শিক্ষাক্রমে এগুলোর প্রতিফলন সুনিশ্চিত করতে হয়। মূলত শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা ও কাঙ্খিত আচরণিক পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি দক্ষ, দেশপ্রেমিক, আত্মনির্ভরশীল, নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন, শ্রমনিষ্ঠ সুনাগরিক জনগোষ্ঠী গড়ে তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য। এসকল তাগিদের ভিত্তিতেই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করতে হবে। আর সেই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আলোকেই রচিত হতে হবে পাঠ্যপুস্তক। তাই শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব অপরিসীম। লক্ষ রাখতে হবে যে প্রকৃত শিক্ষা জীবনঘনিষ্ঠ হবে এবং তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি, অনুসন্ধিৎসা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে সহায়ক হবে।

কৌশল

ক. **শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি**

১. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে নির্ধারিত বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রম পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই হবে এক ও অভিন্ন। সব রকম প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় তা অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করবে।

২. সর্বস্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে সামাজিক, মানবীয় এবং নৈতিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটবে।

৩. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরসহ শিক্ষার প্রতিটি স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মাতৃভাষা, দেশে বিরাজমান পারিপার্শ্বিকতা, আপন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের প্রতিফলন ঘটবে।

৪. প্রাথমিক স্তরের এই শিক্ষাক্রম দেশজ আবহের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনঘনিষ্ঠ ও অত্যাবশ্যক শিখনক্রমের (essential learning continuum) ভিত্তিতে রচিত হবে।

৫. জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন এবং মানবিক মূল্যবোধকে উজ্জীবিত করে যেন দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে শিক্ষা প্রক্রিয়ায় তার ব্যবস্হা থাকতে হবে, এবং আত্মকর্মসংস্হান ও শ্রমের প্রতি শিক্ষার্থী যেন আগ্রহী হয় এবং শ্রমের মর্য্যাদা উপলব্ধি করতে পারে তার প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

৬. স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর জ্ঞান যাতে সৃজনশীলতা ও মুক্তচিন্তা উৎসাহিত করে এবং নূতন নূতন গবেষণা কাজে উদ্বুদ্ধ করে শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে সাবলীলভাবে এগিয়ে যেতে পারে সেই লক্ষ্য সামনে রেখে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস করতে হবে।

খ. পাঠ্যপুস্তক

১. প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য পাঠসহায়ক সামগ্রীর মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিভাগ পর্যায়ক্রমে বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে।

২. মাধ্যমিক স্তরের জন্য শ্রেণী ও বিষয়ভিত্তিক সকল পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ, প্রকাশ ও বিনামূল্যে যথাসময়ে বিতরণে অনুসৃত নীতি অব্যাহত থাকতে পারে। তবে তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৩. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তককে আকর্ষণীয় ও সুন্দরভাবে মুদ্রণ ও যথাযথভাবে সঠিক সময়ে বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত বইয়ের লেখকদের এককালীন সম্মানী প্রদান করতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ে যোগ্য লেখকদেরকে বই লিখার জন্য উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিশেষ সম্মানী ও স্বীকৃতির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৫. উচ্চশিক্ষার জন্য নির্ধারিত পুস্তক এবং উন্নতমানের সৃষ্টিশীল ও গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য প্রকাশকদের উৎসাহিত করতে হবে।

৬. পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন, পরিমার্জন ও সংস্কার সাধনের জন্য মৌলিক ও বাস্তব ভিত্তিক গবেষণা, কর্মপরিকল্পনা ও গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রয়োগ এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির দিকনির্দেশনা গ্রহণ করা হবে।

৭. পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জন ও উন্নয়নের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।

৮. স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার সঠিক বিকাশ, ক্রম অগ্রগতি ও জ্ঞানের আধুনিকতাকে বিবেচনায় রেখে পাঠ্যপুস্তক ও রেফারেন্স বই নির্বাচন করা উচিত।

৯. প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক ও রেফারেন্স বই যাতে সহজে ছাত্রছাত্রীরা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য লাইব্রেরী উন্নয়ন ও লাইব্রেরীতে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

গ. পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নীতিমালা

১. বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের যে নির্দেশনা বর্তমান শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে রয়েছে তা বাস্তবতার আলোকে পরিবর্তন করা হবে।

২. পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির প্রতিটি বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনার যে নীতিমালা নির্দেশ করা হয়েছে, সে অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।

ঘ. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

১. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে পেশাগত দক্ষতাসম্পন্ন ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকবল দিয়ে সমৃদ্ধ করতে হবে।

২. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক উন্নয়নে দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, দক্ষ, অবসরপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞগণের মধ্য থেকে উপদেষ্টা নিয়োগ করা যেতে পারে।

২৭ শিক্ষা প্রশাসন

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

দেশের শিক্ষানীতির সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করে শিক্ষা ব্যবস্হাপনা ও প্রশাসনের ওপর। আমাদের দেশের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। একাধিক প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষার সম্প্রসারণ ও গুণগত উৎকর্ষ সাধনের কাজ চলছে। শিক্ষানীতির আঙ্গিকে আরো অনেক কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। সাথে সাথে চলতি কার্যক্রমের পরিমার্জন করতে হবে। এগুলোর সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করছে সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্হাপনার ওপর। কাজেই সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্হাপনা ও প্রশাসনকে দক্ষ, গতিশীল, জবাবদিহিমূলক, স্বচ্ছ এবং ফলপ্রসূ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বাস্তবতা ও চাহিদার আলোকে নির্ধারণ ও বাসত্মবায়ন করা হবে।

- শিক্ষা সংক্রান্ত সকল আইন, বিধি-বিধান ও আদেশাবলী একত্রিত করে এই শিক্ষানীতির আলোকে এবং এর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমন্বিত শিক্ষাআইন প্রবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

কৌশল

শিক্ষা সংক্রান্ত মন্ত্রণালয় ঃ পুনর্বিন্যাস

উচ্চ শিক্ষা আরো সুসংহত এবং উচ্চ মানসম্পন্ন মৌলিক গবেষণা ও দেশের বাস্তবতার আলোকে প্রায়োগিক গবেষণার বিস্তর প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে সরকারের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নীতি ও কর্মসূচির সঙ্গে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের সমন্বয় জরুরি এবং তা সরকারী নীতি ও আগ্রহের মাধ্যমেই সম্ভব। এছাড়া উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা সমাধানেও সরকারের নিকনির্দেশনা এবং সহযোগিতা কাম্য। অপরদিকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক এবং গণশিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবস্হাপনা এবং সমস্যা ও সম্ভাবনা অনেকাংশে একই ধরণের। এই পর্যায়গুলোর ব্যবস্হাপনা ও মানোন্নয়নে সমন্বিত কার্যক্রম খুবই সহায়ক হবে।

তাই শিক্ষামন্ত্রণালয়কে পুনর্বিন্যাস করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয় গঠন করা বাঞ্ছনীয়।

প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষা কমিশন

এই শিক্ষানীতির আলোকে সকল স্তর ও ধারার শিক্ষা কার্যক্রমের সমন্বিত সুষ্ঠু ও কার্যকর বাস্তবায়নে সহায়তাদান ও নজরদারি করার জন্য একটি শিখর প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক, প্রাথমিক ইত্যাদি স্তরে এবং সাধারণ, কারিগরি, মাদরাসা ইত্যাদি ধারায় শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য একাধিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্হা রয়েছে, যার অধিকাংশ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন হলেও এদের মধ্যে সমন্বয় এবং সংযোগের অভাব রয়েছে, যে কারণে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত উন্নয়ন এবং অগ্রগতি সাধিত হচেছ না। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বেশ

কয়েকটি শিক্ষা কমিশন/কমিটি গঠন করা হলেও শিক্ষানীতি ২০০০ একমাত্র প্রণীত শিক্ষানীতি। বাকী সবক্ষেত্রে প্রতিবেদন দেয়া হয়েছে কিন্তু সেই প্রতিবেদনগুলোকে নীতিতে রূপান্তর করা হয়নি। শিক্ষানীতি ২০০০ ও কুদরত-ই খুদা কমিশন-এর প্রতিবেদন বিশদভাবে পর্যালোচনা করে এবং অন্যান্য শিক্ষা কমিশন/কমিটির প্রতিবেদন বিবেচনায় নিয়ে এবং সংশ্লিষ্টদের ব্যাপক মতামত নিয়ে শিক্ষানীতি ২০০৯ প্রণীত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য যে, শিক্ষানীতি কোন স্থবির বিষয় হতে পারে না। সময়ের প্রয়োজনে দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক ও জাতীয় প্রেক্ষাপটে শিক্ষানীতির পরিমার্জন ও প্রয়োজনে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চলমান থাকবে। শিক্ষা সংক্রান্ত সকল তথ্য-উপাত্ত , তথ্য-প্রযুক্তি সংরক্ষণ ও ব্যবহার করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

- উপর্যুক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে আইনের মাধ্যমে স্বায়ত্বশাসিত সংবিধিবদ্ধ একটি **স্থায়ী জাতীয় শিক্ষা কমিশন** গঠন করা প্রয়োজন। এই কমিশন জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন-এর (বা নাম পরিবর্তন করা হলে: উচ্চশিক্ষা কমিশন) পরামর্শদানকারী সংস্থা হবে। বিভিন্ন স্তর ও ধারায় শিক্ষানীতির সুষ্ঠু ও কার্যকর বাস্তবায়ন কিভাবে হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করা, এতদসংক্রান্ত বাৎসরিক প্রতিবেদন সরকার ও জাতীয় সংসদের কাছে উপস্থাপন করা ও সুপারিশমালা প্রদান করা হবে এই কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব। শিক্ষানীতির সময়োপযোগী পরিমার্জন ও প্রয়োজনে পরিবর্তন করার সুপারিশ তৈরি করাও এই কমিশনের দায়িত্ব হবে।
- এই কমিশনের সদস্য হবেন উচ্চযোগ্যতা, মর্যাদা ও ধী-সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ যাদের মধ্যে শিক্ষক, শিক্ষানুরাগী, প্রশাসক ও জনপ্রতিনিধি থাকবেন। কমিশন একজন পূর্ণকালীন চেয়ারম্যান এবং কয়েকজন পূর্ণকালীন ও খন্ডকালীন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে এবং এর স্বতন্ত্র সচিবালয় ও অর্থসংস্থান থাকবে। এর চেয়ারম্যান ও সদস্যদের পদাধিকার, মর্যাদা, দায়িত্ব, ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের অনুরূপ হবে।

এমপিওভুক্ত, প্রাথমিক থেকে কলেজ পর্যন্ত শিক্ষক নির্বাচন, প্রশিক্ষণ, বদলি ও পদোন্নতি ও নিয়োগ

১. সরকারী কর্মকমিশনের আওতায় নয় এরকম সকল সরকারি এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে) শিক্ষক নিয়োগের জন্য একটি অভিন্ন সুষ্ঠু নিয়োগবিধিমালা থাকা বাঞ্ছনীয়। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য যে পৃথক **শিক্ষক নির্বাচন ও উন্নয়ন কমিশন** গঠন করা হবে বলে অধ্যায় ২ ও ৪-এ বলা হয়েছে তার মাধ্যমে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নির্বাচন করে এলাকাভিত্তিক ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রুত শিক্ষক নিয়োগদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

২. এমপিওভুক্ত মাধ্যমিক ও স্নাতক (ডিগ্রি কলেজ) শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ (প্রশাসনিক) বিভাগীয় পর্যায়ে সমন্বয় করে সেই বিভাগে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান এবং অন্যান্য সকল শিক্ষকের চাকুরী বদলিযোগ্য করা হবে।

৪. সকল পর্যায়ে শিক্ষকদের নিয়মিত বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক হবে এবং পদোন্নতি ও বেতনবৃদ্ধি প্রশিক্ষনের সাথে সম্পর্কিত হবে। বৃহত্তর পরিসরে শিক্ষকদের মৌলিক সুবিধাদি নিশ্চিত করে অন্যান্য সুবিধাদি, পদোন্নতি, বেতনবৃদ্ধি ইত্যাদিকে অর্জিত শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে সম্পর্কিত করা হবে।

শিক্ষার স্তরভিত্তিক কতিপয় কৌশল

প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্হাপনা বর্তমান সময়ের বাস্তবতা ও চাহিদার আলোকে পুনর্বিন্যাস করা হবে। এতে স্হানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করা হবে।

কৌশল

১. প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান ব্যবস্হাপনার সামগ্রিক বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। বিদ্যালয় ব্যবস্হাপনা কমিটিকে প্রয়োজনে আরো ক্ষমতা দিয়ে কার্যকর করে তোলা হবে। নারী অভিভাবকের সম্পৃক্ততা বাড়িয়ে শিক্ষক-অভিভাবক কমিটি গঠন করে এবং এটিকে অধিকতর কার্যকর করে অভিভাকদের বিদ্যালয়ের কর্মকান্ডে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করা হবে। এছাড়াও স্হানীয় জনসাধারণকে প্রাথমিক শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্হাপনা ও এর মানোন্নয়ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে হবে (অধ্যায় ২-এ এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে)।

২. শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য যথাযথ মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ অত্যন্ত জরুরী। তাই শিক্ষক নির্বাচন কমিশন-এর মাধ্যমে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

৩. শিক্ষকদের বাৎসরিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রধান শিক্ষক করবেন। প্রধান শিক্ষকের কাজের মূল্যায়ন করার ব্যবস্হা ব্যবস্হাপনা কমিটির মাধ্যমে জোরদার করতে হবে।

৪. বিদ্যালয়গুলোর পরিবীক্ষণ আরো কার্য্যকর করতে হবে।

মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা

আধুনিক যুগোপযোগী ও বাস্তবমুখী শিক্ষা প্রশাসন ছাড়া শিক্ষার সফল প্রসার ও মানোন্নয়ন সম্ভব নয়। এ লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা প্রশাসনকে প্রয়োজনানুসারে সংস্কার করা হবে। স্হানীয় জনসাধ্যরণকে এই প্রক্রিয়ায় কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্হা করা হবে।

কৌশল

১. মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনে ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তৃত্বকে বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যন্ত বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। জেলা শিক্ষা অফিসারের পদটি জেলার অন্যান্য কর্মকর্তার সঙ্গে সুসমঞ্জস্য করতে হবে।

২. বিদ্যালয়/কলেজ ব্যবস্হাপনা কমিটিকে প্রয়োজনে অধিকগর ক্ষমতা দিয়ে আরো জোরদার করা হবে। অভিভাবক, স্হানীয় শিক্ষা অনুরাগী ও নেতৃবৃন্দ এবং স্হানীয় সরকার সমন্বয়ে জন তত্ত্বাবধানের ব্যবস্হা করা হবে (অধ্যায় ৪ দ্রষ্টব্য)।

৩. অ্যাকাডেমিক তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ জোরদার করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের সংখ্যানুপাতে বিদ্যালয় পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি করতে হবে যেন প্রতিটি বিদ্যালয় প্রতি মাসে অন্তত একবার বিস্তারিতভাবে পরিদর্শন করা সম্ভব হয়।

৪. অধিদপ্তরে বর্তমান EMIS কম্পিউটার সেলকে সম্প্রসারণ করে আধুনিকীকরণ করা হবে।

৫. মেধা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নির্বাচিত শিক্ষকদের শিক্ষা প্রশাসনে নিযুক্ত করা যেতে পারে এবং তাঁদের পদোন্নতির সুযোগ থাকতে হবে।

৬. স্কুলম্যাপিং কার্যক্রমের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে অনুমোদন প্রদান করা উচিত।

৭. সরকারী কর্ম কমিশনের আওতায় নয় এরকম সকল সরকারি এবং সকল বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (প্রাইমারী থেকে কলেজ পর্যন্ত) শিক্ষক নিয়োগের জন্য একটি অভিন্ন সুষ্ঠু নিয়োগ বিধিমালা থাকা বাঞ্ছনীয় (যা অধ্যায় ২ ও ৪-এ প্রস্তাবিত পৃথক শিক্ষক নির্বাচন কমিশন বাস্তবায়ন করবে)।

৮. সরকারি/বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য দূরীকরণার্থে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সমান সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্রমান্বয়ে সরকারের আর্থিক পরিস্হিতি এবং শিক্ষকদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণগত যোগ্যতার আলোকে মূল বেতনসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সরকার থেকে প্রদান করা হবে এবং বেসরাকরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে বর্তমান অনুপাত পদ্ধতি বাতিল করে জেষ্ঠ্যতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সকল পর্যায়ে পদোন্নতির ব্যবস্হা করতে হবে। এছাড়া প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করে চিকিৎসা ব্যয়, অকালমৃত্যুতে পরিবারকে এককালীন সহায্য করা, পেনশন, অবসরকালীন এককালীন আর্থিক সুবিধা প্রদান ইত্যাদি ব্যবস্হা করা বাঞ্ছনীয়।

৯. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা জরুরি। এই নীতিমালায় জাতীয়করণকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকরি সংক্রান্ত বিধি বিধান থাকতে হবে যাতে কর্ম কমিশন কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। একই সাথে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থাও থাকতে হবে।

১০. যে সকল উপজেলায় সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ নাই সেসকল উপজেলায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ সরকারিকরণ করার ব্যবস্হা গ্রহণ করা হবে।

১১. ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকের সংখ্যানুপারে সরকারি স্কুল, কলেজ, টি টি কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ জেলা শিক্ষা অফিস, আঞ্চলিক অফিস ও অধিদপ্তরে প্রয়োজনানুসারে কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

১২. ব্যক্তি বা বেসরকারী কোনো প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্হাপনায় আনা দরকার। এ সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। সমতার ভিত্তিতে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার মাধ্যমে এ সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১৩. শিক্ষা প্রশাসনে সচিব পর্যন্ত সকল স্তরে যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

১৪. শিক্ষা প্রশাসনে নিয়োজিত সকল সংস্হার জন্য দায়িত্ব নির্ধারণ করে তা যথাযথ পালনের জন্যে লোকবল ও অর্থবল এর ব্যবস্হা করতে হবে। পাশাপাশি যথাযথ জবাবদিহিতার ব্যবস্হা থাকতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চশিক্ষা প্রশাসন

১. বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এ দেশে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন ও নেতৃত্ব প্রদান করবে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার মান যাতে একটি মর্যাদাপূর্ণ আসনে স্হিত হয় তার ব্যবস্হা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন এবং সেগুলোর বাস্তবায়ন এই কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব বলে বিবেচিত। সকল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় উন্নয়ন প্রকল্প, নতুন বিভাগ খোলা, বর্তমান বিভাগের সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্ববিদালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুমতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেবে। তবে নতুন পদসৃষ্টি, নতুন বিভাগ, কেন্দ্র বা ইনস্টিটিউট খোলা এবং নির্ধারিত সংখ্যার অধিক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সিদ্ধান্ত অর্থপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা সাপেক্ষে নিতে হবে। উচ্চশিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্হাপনার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় আইন ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আইন-এর মধ্যে যে সকল অসঙ্গতি রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করে দূর করতে হবে। যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন সরকারী অর্থায়নে পরিচালিত, এর সকল কর্মকান্ড স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ভিত্তিক হতে হবে। এলক্ষ্যে মঞ্জুরী কমিশন আইন প্রয়োজনীয়ভাবে সংশোধন করতে হবে।

২. সকল সরকারী ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্মকান্ড, কর্মপরিধি পরীক্ষা ও পর্যালোচনা এবং শিক্ষার মান সংক্রান্ত বিষয়াদি পরিবীক্ষণের দায়িত্বে থাকবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন। যুগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯২ সালে প্রবর্তিত এবং ১৯৯৭ সংশোধিত বেসরকারি পালন করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় আইন পরিমার্জন করা হবে।

৩. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কার্যপরিধি বিবেচনায় নিয়ে এর নামকরণ **উচ্চশিক্ষা কমিশন** করা হলে বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটবে। এই কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের পদমর্যাদা সরকারি কর্মকমিশনের অনুরূপ হবে।

৪. সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্নাতক ও পরবর্তী) মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা পরিচালনায় সক্ষম কি না এবং শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত ব্যয় যৌক্তিক কি না, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পড়াবার যথাযথ ব্যবস্থা আছে কি না সে সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রত্যায়ন জরুরি। এ প্রত্যায়নের দায়িত্ব পালন করার জন্য যথাযথ ক্ষমতা ও দক্ষতা সম্পন্ন একটি **অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল** প্রতিষ্ঠা করা হবে । এই কাউন্সিলে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের (শিক্ষাবিদ, প্রশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য, আইনবিদ ইত্যাদি) প্রতিনিধিত্ব থাকবে। অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল-এর সংগৃহিত তথ্যাবলী ও এর ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত বাৎসরিক সমীক্ষা (প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত শাখাসমূহের ভিত্তিতে) ও প্রদত্ত মূল্যায়নের আলোকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (উচ্চশিক্ষা কমিশন) ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানভিত্তিক যথাযথ ব্যবস্থা (যেমন, উচ্চমান সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ প্রদান এবং যথাযথ মানসম্পন্ন নয় এমন প্রতিষ্ঠানকে মানোন্নয়নে সহায়তা করা বা ক্ষেত্র বিশেষে বন্ধ করে দেয়া ইত্যাদি) গ্রহণ করবে। এ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এর চেয়ারম্যান, সদস্য ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের পদমর্যাদা সরকারি কর্মকমিশনের অনুরূপ হবে। কাউন্সিল-এর গঠণ, দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে নীতিমালা তৈরি করতে হবে।

৫. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মান-নির্ণয় এবং সেই ভিত্তিতে প্রতিবছর এগুলোর র‍্যাংকিং নির্ধারণ করার জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য যথাযথ প্রতিনিধিত্ব সম্বলিত ও ক্ষমতাসম্পন্ন একটি এ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল প্রতিষ্ঠতা করা বাঞ্ছনীয়।

৬. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী (উচ্চশিক্ষা) কমিশন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা ক্ষেত্র বিশেষে অন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস করতে পারবে, যাতে অতিরিক্ত প্রশাসনিক দায়িত্বভার শিক্ষকদের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত না করে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

১. অনুমোদনকারী ও প্রশিক্ষণদানকারী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব ও ব্যাপকতা বিশাল হওয়ায় এর কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। প্রত্যেক বিভাগীয় সদরে কেন্দ্র স্থাপন করে এর কার্যক্রমের বিকেন্দ্রীকরণ করা জরুরি প্রতীয়মান হওয়ায় দ্রুত এই কাজ সম্পন্ন করতে হবে। কেন্দ্রগুলোকে বিধিবদ্ধভাবে দায়িত্ব ও ক্ষমতা দিতে হবে। সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী (উচ্চশিক্ষা) কমিশনকে এক্ষেত্রে জরুরিভিত্তিতে পদক্ষেপ নিতে হবে।

২. গাজীপুরে অবস্থিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ক্যাম্পাস-এর দিক-নির্দেশনা ও তদারকিতে বিভাগীয় কেন্দ্রগুলো পরিচালিত হবে। এই কেন্দ্রীয় ক্যাম্পাস ঢাকা বিভাগীয় কেন্দ্র হিসাবেও দায়িত্ব পালন করবে। পরবর্তীতে এসকল কেন্দ্রকেও স্ব স্ব এলাকার জন্য পৃথক পৃথক অ্যাফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা যেতে পারে। সেই লক্ষ্যে কেন্দ্রগুলোর জন্য পর্যাপ্ত ভূমি বরাদ্দের কথা বিবেচনা করা যায়।

২৮ শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে বিশেষ কয়েকটি পদক্ষেপ

১. যে কোন স্তরের শিক্ষা সমাপনান্তে কর্মসংস্থানের লক্ষ্য সামনে রেখে শিক্ষাজীবনে লব্ধ শিক্ষাগত যোগ্যতা বা কারিগরি দক্ষতা ও শ্রমবাজারের চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এর জন্য দ্রুত শ্রম বাজারে কারিগরি দক্ষতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার চাহিদা ও সরবরাহ জরিপ করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তরে জরিপ অব্যাহত রাখতে হবে। জরিপে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী যে সকল ক্ষেত্রে বিশেষ কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন জনবলের তাৎক্ষণিক চাহিদা রয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত অর্থ ও উপকরণ বরাদ্দ ও উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী নিবিড় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে চাহিদাসম্পন্ন ক্ষেত্রে দ্রুত পর্যাপ্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। দেশে মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী জনবলের চাহিদা নির্ণয় করে সে অনুযায়ী জনশক্তি গড়ে তুলতে হবে। এ সকল ক্ষেত্রে পাবলিক-প্রাইভেট-পার্টনারশিপ এর ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে আর্থসামাজিক ও বিভিন্নভাবে পশ্চাদপদ অবস্থা থেকে আসা ছেলে-মেয়েরা যাতে এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে তার সুযোগ ও ব্যবস্থা থাকতে হবে।

২. পর্যায়ক্রমে সকল স্তরে শিক্ষাগত যোগ্যতা, শিক্ষালব্ধ দক্ষতা ও আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন জনশক্তির চাহিদার সমন্বয় বিধানের লক্ষ্যে কার্যক্রম প্রণয়ন করতে হবে।

৩. স্তর ও ধারা নির্বিশেষে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রযোজ্য শর্ত পূরণ সাপেক্ষে (যেমন প্রশাসনিক ও ভৌত কাঠামো, ছাত্র ও শিক্ষক সংখ্যা, ছাত্র বেতন ও শিক্ষক পারিশ্রমিক, অর্থায়ন, পাঠ্যক্রম, সহপাঠক্রম, শিক্ষার উপকরণ ইত্যাদি) যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধিত হতে হবে। নিবন্ধিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রতি বছর বহিঃনিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষিত হতে হবে এবং নিরীক্ষিত হিসাবের অনুলিপি নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে। এ ব্যাপারে যথাযথ আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

৪. যেসব বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়ের উৎস আছে এবং যে সব প্রতিষ্ঠান মিশনারি, ট্রাস্ট ও দেশী-বিদেশী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত সে সকল ক্ষেত্রে সরকারের শিক্ষাখাত থেকে বরাদ্দ দেওয়া হবে না। তবে এ সকল প্রতিষ্ঠানকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে নিবন্ধিত হতে হবে এবং শিক্ষার স্তরভিত্তিক প্রযোজ্য অভিন্ন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও অন্যান্য নীতিমালা বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করতে হবে। এছাড়া বর্তমানে অধিক হারে বেতন আদায়কারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বেতন আদায়ের বিষয়ে নীতিমালা তৈরি করতে হবে। চাঁদা আদায়ের বিষয়টিও নীতিমালার আওতায় আনতে হবে।

৫. প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্নমুখী বিচ্যুতি ও অসংগতির কারণে শিক্ষক সমাজের একাংশের নৈতিকতাবোধের অভাবে দেশে ব্যাপকভাবে প্রাইভেট টিউশনের ব্যবস্থা এবং কোচিং সেন্টার চালু হয়েছে। যথোপযুক্ত প্রতিকারের ব্যবস্থা নিয়ে প্রচলিত প্রাইভেট ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রন ও নিরুৎসাহিত করে শিক্ষার্থীদের বিকাশের জন্য ক্ষতিকর এ ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে হবে।

৬. বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে যে, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কারিগরি, মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অস্তিত্বহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি শিক্ষকদের প্রাপ্য সরকারি অনুদান ও বিদ্যালয়ে সরকার কর্তৃক দেয় অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে। অনুসন্ধানের মাধ্যমে এসকল ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও লোককে চিহ্নিত করে যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে, প্রয়োজনে জোরদার করা হবে।

৭. শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি ও বজায় রাখার স্বার্থে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে দলভিত্তিক রাজনীতির উর্দ্ধে রাখা জরুরী। এই লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন ও কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

৮. শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর জন্য আচরণবিধি তৈরি করা এবং তা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবগত করা জরুরি। এই লক্ষ্যে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের জন্য পৃথক পৃথক উপযুক্ত কমিটি গঠন করে দ্রুত আচরণবিধি তৈরির কাজ সম্পন্ন করার পদক্ষেপ নিতে হবে। শিক্ষার কোনো স্তরেই শিক্ষার্থীরা যেন কোনোভাবেই শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের মুখোমুখি না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

৯. ব্যাংক, বেসরকারি শিল্প-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদেরকে শিক্ষা বৃত্তি প্রদানে উৎসাহিত করা হবে। এই লক্ষ্যে একটি পদক্ষেপ হতে পারে কোনো উৎস উল্লেখযোগ্য পরিমাণ (যা প্রচলিত বিধিবিধান বিবেচনায় নিয়ে নির্ধারণ করতে হবে) বৃত্তি প্রদান করলে প্রদত্ত অর্থ করমুক্ত হবে বলে যথাযথভাবে সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে ঘোষণা দেয়া।

১০. প্রাথমিক মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মচারী (তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী)-এর সংখ্যা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সংখ্যা এবং তাদের কাজের পরিমাণ বিবেচনায় নিয়ে নির্ধারণ করতে হবে। এর জন্য একটি নীতিকাঠামো তৈরি করা প্রয়োজন। কর্মচারীদের চাকুরির নিয়মাবলী তৈরি করে তা বিধিবদ্ধ করতে হবে এবং যারা চাকুরিতে আছেন তাদেরকে তা অবগত করতে হবে। আর যারা পরে কাজে যোগদান করবেন তাদেরকে নিয়োগপত্রের সঙ্গে নিয়মাবলী লিখিতভাবে জানাতে হবে। তাদের বেতনকাঠামো যুগোপযুগী করা প্রয়োজন।

১১. সর্বপর্যায়ের শিক্ষা সংক্রান্ত সকল তথ্য একত্র করে একটি তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক সমৃদ্ধ তথ্যভান্ডার গড়ে তুলতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলেই যাতে সহজে তা ব্যবহার করার সুযোগ পান সেরকম ব্যবস্থা করতে হবে। এ সকল তথ্য হালনাগাদ থাকতে হবে। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (BANBEIS)-কে এই লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি, নেটওয়ার্কিং, অর্থ ও জনবল দিয়ে আরো শক্তিশালী করা যায়। তবে কার্যকর তদারকির মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম যাতে দক্ষতা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে পরিচালিত হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। বেসরকারী উদ্যেগেও শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যভান্ডার সৃষ্টি উৎসাহিত করা হবে।

১২. বেসরাকরী এমপিও ভুক্ত শিক্ষকদের সাথে বয়স সীমার সমতা বিধান করার জন্যে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের চাকুরীর বয়স ৬০ বৎসরে উন্নীত করা বাঞ্ছনীয়।

১৩. বাংলা ভাষার উন্নয়নে আরো কার্যকর ভূমিকা রাখা এবং ব্যাপকভাবে বিদেশী ভাষার আধুনিক বই, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন শাখার জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্যবই বাংলায় অনুবাদ করার জন্য বাংলা একাডেমীকে উৎসাহিত এবং লোকবল ও অর্থবল দিয়ে সহায়তা করা জরুরি।

১৪. বাংলাদেশে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা ও তৎসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও গবেষণার ব্যবস্থা করার জন্য স্থাপিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে কার্যকর ও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হবে।

২৯ অর্থায়ন

শিক্ষাখাতে সরকারী ব্যয়বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বাড়ানো হবে। ডাকার ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী একটি রাষ্ট্রকে তার জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশকে শিক্ষা খাতে ব্যয় করতে হবে। বাংলাদেশ এই ফ্রেমওয়ার্কে স্বাক্ষরকারী কাজেই পর্যায়ক্রমে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রত্যেক স্তরকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হবে। প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন বলে এক্ষেত্রে বিশেষ জোর দিতে হবে। শিক্ষা কাঠামোয় মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গণশিক্ষা অর্থাৎ উপানুষ্ঠানিক ও বয়স্ক শিক্ষাও বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে। অর্থনীতিসহ জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা বিশেষ অবদান রাখে। শিক্ষার প্রসারে প্রত্যেক স্তরের গুরুত্বের ভিত্তিতে অর্থবরাদ্দ নিশ্চিত করা হবে। নতুন শিক্ষানীতিতে এ বিষয়ে দিকনির্দেশনা রয়েছে।

সরকারী বরাদ্দ ছাড়াও শিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারী/পারিবারিক উৎস থেকে খরচ করা হয়। শিক্ষাখাতে বেসরকারী উদ্যোগ উৎসাহিত করা হবে। কলেজ ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে (অর্থাৎ তাদের পরিবার সমূহকে) তাদের পড়াশুনার খরচ সংকুলানে নিজেদের দায়িত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করতে হবে। যাদের প্রয়োজন তাদের জন্য স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে শিক্ষাঋণের ব্যবস্থা করার পদক্ষেপ নেয়া হবে।

১. **প্রাক্কলিত ব্যয়, ২০১৭-১৮ সাল পর্যন্ত**

সাধারণ ব্যয় বৃদ্ধি

শিক্ষা খাতে সরকারী খরচ বিভিন্ন কারণে শিক্ষক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী বৃদ্ধি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি, বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রেণীকক্ষ বৃদ্ধি ও অবকাঠামো উন্নয়ন, ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন বৃদ্ধি বছর বছর সাধারণভাবে ঘটতে থাকে।

২. **নতুন শিক্ষানীতি উদ্ভূত ব্যয় বৃদ্ধি**

সাধারণভাবে বর্দ্ধিত ব্যয় ছাড়া আগামী ২০১৭-১৮ সাল পর্যন্ত সময়ে বিশেষভাবে খরচ বাড়বে এই নতুন শিক্ষানীতি উদ্ভূত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের কারণে। এগুলোর মধ্যে আছে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত চিহ্নিত করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্বিন্যাস, কারিগরি শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ, শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ জোর দেয়া, নতুন নতুন বই এর ব্যবস্থা করা, উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন এবং মানসম্পন্ন গবেষণার সম্প্রসারণ, শিক্ষার সকল পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তি প্রবর্তন অথবা জোরদারকরণ এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন।

হিসাব করা হয়েছে যে, এই সকল কারণে ২০১৭-১৮ সাল পর্যন্ত সময়ে বিভিন্নখাতে মোট বর্দ্ধিত খরচ হবে ৬৮,০০০ কোটি টাকা। সংযোজনী ৫-এর সারণী ১-এ এই ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব দেখানো হয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে, বর্তমানে যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এবতেদায়ী মাদ্‌রাসা বিদ্যমান আছে সেগুলোর প্রত্যেকটিতে গড়ে ৬টি করে শ্রেণী কক্ষ বাড়াতে হবে যাতে করে এ সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণী এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মানবিক, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কারিগরি-সহ সকল প্রকার শিক্ষাদান সম্ভব হয়।

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী চলে যাবার কারণে মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয় ও মাদ্‌রাসায় বিভিন্ন বিষয়ে (বিজ্ঞান, সাধারণ, বাণিজ্য) একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী খোলার জন্য কম সংখ্যক অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ লাগবে। এসব ক্ষেত্রে ৩টি করে নতুন শ্রেণীকক্ষ লাগবে বলে ধরা হয়েছে। প্রয়োজনমত সকল ক্ষেত্রে আসবাবপত্র সরবরাহ করতে হবে। প্রত্যেক উপজেলায় একটি করে কারিগরি বিদ্যালয় স্হাপন করতে হবে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য বিদ্যমান প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট গুলোর উন্নতি ও প্রয়োজনানুসারে নতুন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নের দিকে নজর দিতে হবে।

৩. সরকারী ব্যয় সংকুলানের জন্য অর্থের উৎস

সাধারণভাবে বর্দ্ধিত ব্যয়

২০০৮-০৯ সালে শিক্ষাখাতে মোট সরকারী বরাদ্দ ছিল জাতীয় উৎপাদের ২.২৭ শতাংশ। এই হার দ্রুত উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা জরুরি। তা বছর বছর বেড়ে ২০১৭-১৮ সালে জাতীয় উৎপাদের ৬.০ শতাংশে অথবা ৪.৫ শতাংশে (রক্ষণশীল প্রাক্কলন) উন্নীত হলে শিক্ষাখাতে কি পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাবে তা প্রাক্কলন করা হয়েছে।

নতুন শিক্ষানীতি উদ্ভূত অতিরিক্ত ব্যয়

সরকারী শিক্ষা ব্যয় ক্রমান্বয়ে বেড়ে ২০১৭-২০১৮ সালে জাতীয় উৎপাদের ৬.০ শতাংশে অথবা ৪.৫ শতাংশে উন্নীত হলে বছর বছর এই খাতের জন্য যে অর্থ পাওয়া যাবে তার হিসাবও সংযোজনী-৫, সারণী-২-এ দেখানো হয়েছে। আগামী বছর থেকে ২০১৭-১৮ সাল পর্যন্ত সময়ে জাতীয় আয় বৃদ্ধি বছরে গড়ে ৭.০% (উচ্চ) অথবা ৬.০% (রক্ষণশীল) হবে বলে ধরা হয়েছে। এই হিসাব ২০০৯/১০ থেকে ২০১৭-২০১৮ সময়ে শিক্ষাখাতের জন্য সরকারী পর্যায়ে মোট ৩৬০,৯২৫ কোটি টাকা অথবা ২৭৬,০৪০ কোটি টাকা (রক্ষণশীল প্রাক্কলন) পাওয়া যাবে। অর্থাৎ, গড়ে বছরে যথাক্রমে ৩৬,৮১৮ কোটি টাকা অথবা ৩০,৯৭১ কোটি টাকা পাওয়া যাবে।

নতুন শিক্ষানীতির কারণে ২০০৯/১০ থেকে ২০১৭-২০১৮ পর্যন্ত ৯ বছরে প্রাক্কলিত মোট অতিরিক্ত খরচ ৬৮,০০০ কোটি টাকা। এবং গড়ে বছরে ৭,৫৫৬ কোটি টাকা (সংযোজনী ৫, সারণী-১)। শিক্ষাখাতে অর্থপ্রাপ্তির রক্ষণশীল প্রাক্কলন ভিত্তিক প্রাপ্ত অর্থ (বছরে গড়ে ৩০,৬৭১ কোটি টাকা এবং শেষ বছরে ৪৬, ৭৫৬ কোটি টাকা) এই খাতের অন্যান্য (অবশ্যই বর্দ্ধিষ্ণু) খরচ মিটিয়েও নতুন এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে অর্থের সংকট তেমন থাকার কথা নয়। তবে প্রথম দিকে দুই-তিন বছর বিশেষ নজর দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে। আর যদি উচ্চ প্রাক্কলন বাস্তবে অর্জিত হয় তাহলে সবকিছু আরো সহজ হবে।

সংযোজী-৫ এর সারণী ২-এ যে হিসাব দেখানো হয়েছে তাতে ২০১২-১৩ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সহায়তা শিক্ষাখাতে বছরে মোট শিক্ষা ব্যয়ের ১০ শতাংশ ধরা হয়েছে এবং পরবর্তী বছরগুলোর জন্য এই অনুপাত প্রতি বছর ক্রমান্বয়ে কিছু কম ধরা হয়েছে। ফলে ২০১৭-১৮ সালে তা ৬.৭%-এ দাড়াবে। অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে এই প্রাক্কলন বাস্তব বলে ধরা যায়। অবশ্য রক্ষণশীল প্রাক্কলনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহায়তা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। তবে এই যুগোপযোগী শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে প্রয়োজন হলে অধিক আন্তর্জাতিক সহায়তা পাওয়া যেতে পারে।

যেহেতু উপর্যুক্ত হিসাব অনুযায়ী জাতীয় উৎপাদ বৃদ্ধির ওপর দেশীয় উৎস থেকে সরকারী শিক্ষাব্যয়ের জন্য প্রাপ্ত অর্থ বৃদ্ধি নির্ভরশীল তাই এই অর্থপ্রাপ্তি বছর বছর বাড়বে এবং ২০১৭-১৮ সাল পর্যন্ত সময়ের শেষের দিকে প্রাপ্ত অর্থ প্রথম দিকে প্রাপ্ত অর্থ থেকে অনেক বেশি হবে। অর্থ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রতি বছরের কর্মপরিধি নির্ধারণ করতে হবে। তবে প্রয়োজনে প্রথম দিকের কয়েক বছর আন্তর্জাতিক উৎস (সহায়তা) থেকে বেশি অর্থ সংগ্রহ করে এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে প্রথম থেকে গতিশীলতা আনার চেষ্টা করতে হবে। পরবর্তীতে জাতীয় উৎস থেকেই ব্যয় সংকুলান বেশি হবে।

সংযোজনী - ১

বাংলাদেশের সংবিধানের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কতিপয় বিধান

১৭. রাষ্ট্র

(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠান জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য,

(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য,

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

২৮. ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য

(১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

৪১. ধর্মীয় স্বাধীনতা

(২) কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে তাহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না।

সংযোজনী - ২

প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের জন্য প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রম কাঠামো

শ্রেণী	সাধারণ		মাদরাসা		মন্তব্য
	বিষয়	নম্বর	বিষয়	নম্বর	
১ম ও ২য় (আবশ্যিক)	১.বাংলা ২.গণিত ৩. ইংরেজি	১০০ ১০০ ১০০	বাংলা গণিত ইংরেজি	১০০ ১০০ ১০০	কোন আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না।
অতিরিক্ত বিষয়	৪.ললিতকলা	১০০	আরবী	১০০	
৩য়, ৪র্থ ও ৫ম (আবশ্যিক)	বাংলা গণিত ইংরেজি জলবায়ু পরিবর্তনসহ পরিবেশ বাংলাদেশ স্টাডিজ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০	বাংলা গণিত ইংরেজি জলবায়ু পরিবর্তনসহ পরিবেশ বাংলাদেশ স্টাডিজ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০	
অতিরিক্ত বিষয়	ললিতকলা / ইংরেজি মাধ্যমের জন্য তাদের উপযোগী বিষয়	১০০	কোরআন ও তাজবিদ আরবি ১ম পত্র আকাইদ ও ফিকহ্ আরবি ২য় পত্র (শুধুমাত্র ৫ম শ্রেণীতে)	১০০ ১০০ ১০০ ১০০	
৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী	বাংলা ইংরেজি গণিত সাধারণ বিজ্ঞান তথ্যপ্রযুক্তি বাংলাদেশ স্টাডিজ কর্মমুখী শিক্ষা জলবায়ু পরিবর্তনসহ পরিবেশ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০	বাংলা ইংরেজি গণিত সাধারণ বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি বাংলাদেশ স্টাডিজ কর্মমুখী শিক্ষা জলবায়ু পরিবর্তনসহ পরিবেশ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০	
অতিরিক্ত বিষয়	ললিতকলা / ইংরেজি মাধ্যমের জন্য তাদের উপযোগী বিষয়	১০০	কোরান আকাইদ ও ফিকাহ্ আরবী	১০০ ১০০ ১০০	

সংযোজনী - ৩

ক. মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের বিষয় তালিকা (৯ম ও ১০ম শ্রেণী)

সাধারণ শিক্ষা		ভোকেশনাল শিক্ষা		মাদরাসা শিক্ষা	
ক. আবশ্যিক বিষয় (সকল শাখার জন্য)	৭০০	ক. আবশ্যিক বিষয়	৭০০	ক. আবশ্যিক বিষয় (সকল শাখার জন্য)	৮০০
১. বাংলা	২০০	১. বাংলা	২০০	১. বাংলা	২০০
২. ইংরেজি	২০০	২. ইংরেজি	২০০	২. ইংরেজি	২০০
৩. গণিত	১০০	৩. গণিত	১০০	৩. গণিত	১০০
৪. সামাজিক বিজ্ঞান	১০০	৪. সামাজিক বিজ্ঞান	১০০	৪. আল-কুরআন	১০০
(Bangladesh Studies)		(Bangladesh Studies)		৫. হাদিস ও ফিকাহ	১০০
৫. তথ্য প্রযুক্তি	১০০	৫. তথ্য প্রযুক্তি	১০০	৬. আরবি	১০০
খ. বিজ্ঞান শাখা		খ. অন্যান্য আবশ্যিক বিষয়সমূহ	৩০০	বিজ্ঞান শিক্ষা	
নৈর্ব্যচনিক বিষয়		১. উচ্চতর গণিত	১০০	১. পদার্থ বিজ্ঞান	১০০
১. উচ্চতর গণিত	১০০	২. পদার্থ বিজ্ঞান	১০০	২. রসায়ন বিজ্ঞান	১০০
২. পদার্থ বিজ্ঞান	১০০	৩. রসায়ন	১০০	৩. জীব বিজ্ঞান/উচ্চতর গণিত	১০০
৩. রসায়ন বিজ্ঞান	১০০				
৪. জীব বিজ্ঞান	১০০				
ঐচ্ছিক বিষয় (যেকোন ১টি)	১০০	গ. নৈর্ব্যচনিক বিষয়সমূহ		ঐচ্ছিক বিষয় (যেকোন ১টি)	
১. কৃষি শিক্ষা		১. ভোকেশনাল ট্রেড	৩০০	১. তথ্যপ্রযুক্তি	১০০
২. গার্হস্থ্য অর্থনীতি		২. বাস্তব প্রশিক্ষণ	১০০	২. বাংলাদেশ স্টাডিজ	
৩. ভূগোল				৩. জীব বিজ্ঞান	
৪. কর্মমুখী শিক্ষা				৪. উচ্চতর গণিত	
৫. বেসিক ট্রেড		ঘ. ঐচ্ছিক বিষয় (যেকোন ১টি)		৫. কৃষি শিক্ষা	
৬. হিসাব বিজ্ঞান		১. ধর্ম শিক্ষা	১০০	৬. গার্হস্থ্য বিজ্ঞান	
৭. আরবি অথবা সংস্কৃত অথবা পালি		২. ট্রেড বিজ্ঞান		৭. কর্মমুখী শিক্ষা	
৮. সংগীত				৮. বেসিক ট্রেড	
৯. শারীরিক শিক্ষা				৯. হিসাব বিজ্ঞান	
				১০. বিদ্যুৎ বিদ্যা	

সাধারণ শিক্ষা

মানবিক শাখা

নৈর্ব্যচনিক বিষয়

১. ইতিহাস ১০০
২. ভূগোল ১০০
৩. অর্থনীতি/পৌরনীতি ১০০
৪. সাধারণ বিজ্ঞান ১০০

ঐচ্ছিক বিষয় (একটি ঐচ্ছিক)

১. অর্থনীতি ১০০
২. পৌরনীতি
৩. কৃষি শিক্ষা
৪. গার্হস্থ্য অর্থনীতি
৫. উচ্চতর বাংলা
৬. উচ্চতর ইংরেজি
৭. ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা
৮. আরবি /সংস্কৃতি/পালি
৯. কর্মমুখী শিক্ষা
১০. বেসিক ট্রেড
১১. চারু ও কারুকলা
১২. হিসাব বিজ্ঞান
১৩. সংগীত
১৪. শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া

ব্যবসায় শিক্ষা শাখা

১. ব্যবসায় পরিচিতি ১০০
২. হিসাব বিজ্ঞান ১০০
৩. ব্যবসায় উদ্যোগ অথবা বাণিজ্যিক ভূগোল ১০০
৪. সাধারণ বিজ্ঞান ১০০

ভোকেশনাল শিক্ষা

ঙ. বৃত্তিমূলক ট্রেডসমূহ

কৃষি উপশাখাঃ

১. অ্যাকোয়া কালচার
২. এগ্রো-বেজড ফুড
৩. ডেইরি
৪. ফার্ম মেশিনারি
৫. শ্রেরি কালচার
৬. হটি কালচার
৭. মিল্ক এন্ড মিল্ক প্রোডক্টস

ইঞ্জিনিয়ারিং উপ-শাখা ঃ

১. আর্মেচার ওয়েন্ডিং
২. অটোমেটিভ
৩. কেবল জয়েন্টার
৪. কর্পেন্ট্রি
৫. সিরামিক্স
৬. সিভিল কন্সট্রাকশন (মেসিনারি)
৭. ড্রাফটিং (সিভিল)
৮. ইলেক্ট্রিকাল লাইনম্যান
৯. কাউন্ড্রি
১০. জেনারেল ইলেক্ট্রিসিয়ান
১১. জেনারেল মেকানিক্স
১২. হাউজ ওয়্যারিং
১৩. ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেক্ট্রিশিয়ান
১৪. ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স
১৫. মেশিনিস্ট
১৬. প্যাটার্ন মেকিং
১৭. রেডিও এন্ড টি ভি
১৮. প্লাম্বিং এন্ড পাইপ ফিটিং
১৯. রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিংস (ইন্ডাস্ট্রিয়াল)

মাদরাসা শিক্ষা

১১. গার্মেন্টস
১২. অটো সার্ভিস
১৩. উচ্চতর ইংরেজি
১৪. সামাজিক বিজ্ঞান
১৫. ইসলামের ইতিহাস
১৬. উর্দূ
১৭. ফিক্‌হ ও আকাইদ
১৮. আল হাদীস
১৯. স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান

মানবিক শাখা

নৈর্ব্যচনিক

১. আল হাদিস ১০০
২. ফিকহ ও উসুলে ফিকহ ১০০
৩. সাধারণ বিজ্ঞান ১০০

ঐচ্ছিক বিষয় ১০০

১. তথ্যপ্রযুক্তি
২. কৃষি শিক্ষা
৩. গার্হস্থ্য বিজ্ঞান
৪. কর্মমুখী শিক্ষা
৫. বেসিক ট্রেড
৬. হিসাব বিজ্ঞান
৭. বিদ্যুৎ বিদ্যা
৮. গার্মেন্টস
৯. অটো সার্ভিস
১০. উচ্চতর ইংরেজি
১১. সামাজিক বিজ্ঞান
১২. ইসলামের ইতিহাস
১৩. উর্দূ
১৪. ফারসী

সাধারণ শিক্ষা	ভোকেশনাল শিক্ষা	মাদরাসা শিক্ষা
১০০ **ঐচ্ছিক বিষয় (একটি)** ১. তথ্যপ্রযুক্তি ২. বাণিজ্যিক ভূগোল ৩. ব্যবসায় উদ্যোগ ৪. অর্থায়ন ও উৎপাদন ৫. বিপনন ৬. কৃষি শিক্ষা ৭. গার্হস্থ্য অর্থনীতি ৮. উচ্চতর গণিত ৯. কর্মমুখী শিক্ষা ১০. বেসিক ট্রেড ১১. আরবি/সংস্কৃত/পালি ১২. সংগীত	২০. ট্যানারি ২১. ওয়েল্ডিং **ইনফরমেশন উপ-শাখাঃ** ১. কম্পিউটার মেকানিক ২. কম্পিউটার অপারেটর **লেদার উপ-শাখা ঃ** ১. ফুটওয়্যার ২. লেদার প্রোডাক্টস ৩. লেদার ট্যানিং **সার্ভিস উপ-শাখা ঃ** ১. কুকিং ২. ড্রাইভিং ৩. ফুড প্রসেসিং এন্ড প্রিজার্ভেশন ৪. হেয়ার ড্রেসিং ৫. পেইন্টার ৬. সেলসম্যানশিপ **টেক্সটাইল উপ-শাখা ঃ** ১. ড্রেস মেকিং ২. ডাইং, প্রিন্টিং এন্ড ফিনিশিং ৩. গার্মেন্টর্স ম্যানুফ্যাকচারিং ৪. নিটিং ৫. স্পিনিং ৬. উইভিং/ফেব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং **বিবিধ বৃত্তি উপ-শাখাঃ** ১. ফরেস্টি ২. প্রিন্টিং ৩. সেরিকালচার	১৫. ফিক্হ ও আকাইদ ১৬. আল-হাদিস ১৭. স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান ব্যবসায় শিক্ষা নৈর্ব্যচনিক বিষয় ১. ব্যবসায় নীতি ১০০ ২. হিসাব বিজ্ঞান ১০০ ৩. ব্যবসায় উদ্যোগ/বাণিজ্যিক ভূগোল ১০০ ঐচ্ছিক বিষয় ১. অর্থায়ন ও উৎপাদন ২. বিপনন ৩. তথ্যপ্রযুক্তি ৪. কৃষি শিক্ষা ৫. গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ৬. কর্মমুখী শিক্ষা ৭. বেসিক ট্রেড ৮. বিদ্যুৎ বিদ্যা ৯. গার্মেন্টস ১০. অটো সার্ভিস ১১. উচ্চতর ইংরেজি ১২. সামাজিক বিজ্ঞান ১৩. ইসলামের ইতিহাস ১৪. উর্দু ১৫. ফারসী ১৬. ফিক্হ ও আকাইদ ১৭. আল-হাদিস ১৮. স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান

খ. মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের বিষয় তালিকা (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী)

১.সাধারণ শিক্ষা

বিজ্ঞান		মানবিক		ব্যবসায় শিক্ষা	
ক. আবশ্যিক বিষয় ১. বাংলা ২. ইংরেজি ৩. সাধারণ গণিত ৪. সামাজিক বিজ্ঞান (Bangladesh Studies)	৬০০ ২০০ ২০০ ১০০ ১০০	ক. আবশ্যিক বিষয় ১. বাংলা ২. ইংরেজি ৩. সাধারণ গণিত ৪. সামাজিক বিজ্ঞান (Bangladesh Studies)	৬০০ ২০০ ২০০ ১০০ ১০০	ক. আবশ্যিক বিষয় ১. বাংলা ২. ইংরেজি ৩. সাধারণ গণিত ৪. সামাজিক বিজ্ঞান (Bangladesh Studies)	৬০০ ২০০ ২০০ ১০০ ১০০
নৈর্ব্যাচনিক বিষয় ১. পদার্থ বিজ্ঞান ২. রসায়ন বিজ্ঞান ৩. উচ্চতর গণিত	৬০০ ২০০ ২০০ ২০০	নৈর্ব্যাচনিক বিষয় ১. অর্থনীতি ২. সমাজবিজ্ঞান	৪০০ ২০০ ২০০	নৈর্ব্যাচনিক বিষয় ১. ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ ২. হিসাব বিজ্ঞান	৪০০ ২০০ ২০০
ঐচ্ছিক বিষয় (যেকোন একটি) ১. জীব বিজ্ঞান ২. তথ্যপ্রযুক্তি ৩. ভূগোল ৪. মনোবিজ্ঞান ৫. পরিসংখ্যান ৬. কৃষি বিজ্ঞান ৭. হিসাব বিজ্ঞান ৮. আরবি/সংস্কৃত/পালি ৯. আইন শিক্ষা ১০. ক্রীড়া ঃ ফুটবল/হকি/ক্রিকেট/টেনিস/ ভলিবল/সাঁতার/অ্যাথলেটিক্স। *	২০০	নৈর্বাচনিক-১ ও ঐচ্ছিক-১ ১. যুক্তি বিদ্যা ২. উচ্চতর বাংলা ৩. উচ্চতর ইংরেজি ৪. গণিত ৫. পরিসংখ্যান ৬. অর্থনীতি ৭. পৌরনীতি ৮. ভূগোল ৯. মনোবিজ্ঞান ১০. সমাজ কল্যাণ ১১. সমাজ বিজ্ঞান ১২. গার্হস্থ্য অর্থনীতি ১৩. আরবি/সংস্কৃত/পালি ১৪. ইসলামি শিক্ষা ১৫. ইতিহাস/ইসলামের ইতিহাস ১৬. সংগীত	৪০০	নৈর্বাচনিক-১ ও ঐচ্ছিক-১ ১. ব্যবসায় উদ্যোগ ও ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনা ২. অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ভূগোল ৩. অর্থায়ন, উৎপাদন ও বিপনন ৪. তথ্যপ্রযুক্তি ৫. কৃষি বিজ্ঞান ৬. পরিসংখ্যান ৭. সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা ৮. আরবি/সংস্কৃত/পালি ৯. আইন শিক্ষা	৪০০

বিজ্ঞান		মানবিক		ব্যবসায় শিক্ষা	
		১৭. উচ্চাঙ্গ সংগীত ১৮. চারু ও কারুকলা ১৯. নাট্যকলা ২০. কৃষি শিক্ষা ২১. তথ্যপ্রযুক্তি ২২. হিসাব বিজ্ঞান ২৩. শিক্ষক শিক্ষণ ২৪. আইন শিক্ষা ২৫. ক্রীড়া : ফুটবল/হকি/ক্রিকেট/টেবিল টেনিস/ ভলিবল/সাঁতার/বক্সিং/অ্যাথলেটিক্স/			

২. ভোকেশনার শিক্ষা (উপ-ব্যবস্হা)		৩. মাদরাসা শিক্ষা (উপ-ব্যবস্হা)	
ক. আবশ্যিক বিষয় ১. বাংলা ২. ইংরেজি ৩. সাধারণ গণিত ৪. সামাজিক বিজ্ঞান (Bangladesh Studies)	২০০ ২০০ ১০০ ১০০	ক. আবশ্যিক বিষয় ১. বাংলা ২. ইংরেজি ৩. সাধারণ গণিত ৪. সামাজিক বিজ্ঞান (Bangladesh Studies) ৫. আল কুরআন ৬. আল হাদিস	২০০ ২০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
নৈব্যচনিক বিষয় ১. পদার্থ বিজ্ঞান ২. রসায়ন বিজ্ঞান ৩. জীব বিজ্ঞান ৪. উচ্চতর গণিত সাধারণ শাখা নবম-দশম শ্রেণী সমতুল্য	 ১০০ ১০০ ১০০ ১০০	ক. বিজ্ঞান শাখা নৈর্বাচনিক বিষয় ১. পদার্থবিজ্ঞান ২. রসায়ন বিজ্ঞান ৩. জীববিজ্ঞান / গণিত	 ২০০ ২০০ ২০০
ঐচ্ছিক বিষয় ক. একটি ভোকেশনাল ট্রেড খ. সংশ্লিষ্ট ট্রেডে বাস্তব প্রশিক্ষণ ১. এ্যাকোয়াকালচার ২. এগ্রো-বেজড্ ফুড ৩. আর্মেচার ওয়াইন্ডিং ৪. অটো ইলেকট্রিশিয়ান ৫. অটোমোটিভ ৬. কেবল জয়েন্টার	 ৩০০ ১০০	ঐচ্ছিক বিষয় ১টি ১. আরবি ২. ফিক্হ/উসুলে ফিক্হ ৩. গণিত / জীববিজ্ঞান ৪. তথ্যপ্রযুক্তি ৫. কৃষিশিক্ষা ৬. গার্হস্থ্য	২০০

৭. কার্পেন্ট্রি		খ. মানবিক	
৮. সিরামিক্স		নৈর্বাচনিক বিষয়	
৯. সিভিল কন্সট্রাকশন (মেসনারি)		১. ফরায়েজ ফিক্হ ও উসুলে ফিক্হ	১০০
১০. কম্পিউটার মেকানিক্স		২. আরবী	১০০
১১. কম্পিউটার অপারেটর		৩. ইসলামের ইতিহাস	২০০
১২. ব্লকিং		৪. বালাগাত ও মানতিক	২০০
১৩. ডেয়ারি			
১৪. ডেন্টিং এ্যান্ড পেইন্টিং		ঐচ্ছিক বিষয় ১টি	
১৫. ড্রাফটিং (মেকানিক্যাল)		১. উচ্চতর ইংরেজি	
১৬. ড্রাইভিং (সিভিল)		২. পৌরনীতি	
১৭. ড্রাইভিং		৩. উর্দু	
১৮. ডাইং, প্রিন্টিং এ্যান্ড ফিনিশিং		৪. ফার্সি	
১৯. ইলেকট্রিক্যাল লাইনম্যান		৫. ইসলামিক অর্থনীতি	
২০. ফার্ম মেশিনারি		৬. তথ্যপ্রযুক্তি	
২১. ফ্লোরিকালচার		৭. কৃষি অর্থনীতি	
২২. ফুড প্রসিসিং এ্যান্ড প্রিজার্ভেশন		৮. গার্হস্থ্য অর্থনীতি	
২৩. ফরেস্ট্রি			১০০
২৪. ফাউন্ড্রি		গ. ব্যবসায় শিক্ষা	১০০
২৫. গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং		নৈর্বাচনিক বিষয়	২০০
২৬. জেনারেল ইলেকট্রিশিয়ান		১. ফরায়েজ, ফিক্হ ও উসুলে ফিক্হ	২০০
২৭. জেনারেল মেকানিক্স		২. আরবী	২০০
২৮. হেয়ার ড্রেসিং		৩. ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ	
২৯. হর্টিকালচার		৪. হিসাব বিজ্ঞান	
৩০. হাউজ ওয়্যারিং			
৩১. ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রিশিয়ান			

৩২. ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স ৩৩. নিটিং ৩৪. লেদার ৩৫. মেশিনিষ্ট ৩৬. মিল্ক এ্যান্ড মিল্ক প্রোডাক্টস ৩৭. পেইন্টার ৩৮. প্যাটার্ণ মেকিং ৩৯. প্লাম্বিং এ্যান্ড পাইপ ফিটিং ৪০. পোল্ট্রি ৪১. প্রিন্টিং ৪২. রেডিও এ্যান্ড টিভি ৪৩. রেফ্রিজারেশন এ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং (ডোমেষ্টিক) ৪৪. রেফ্রিজারেজন এ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং (ইন্ডাষ্ট্রিয়াল) ৪৫. সেলসম্যানশিপ ৪৬. সেরিকালচার ৪৭. স্পিনিং ৪৮. টার্নার ৪৯. উইভিং ৫০. ওয়েল্ডিং ইত্যাদি		ঐচ্ছিক বিষয় ১টি ১. অর্থায়ন ও উৎপাদন এবং বিপনন ২. অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ভূগোল ৩. পরিসংখ্যান ৪. তথ্য প্রযুক্তি ৫. সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা ৬. ব্যবসায় উদ্যোগ ও ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনা।	

সংযোজনী-৪

কারিগরি শিক্ষার পথনির্দেশিকা

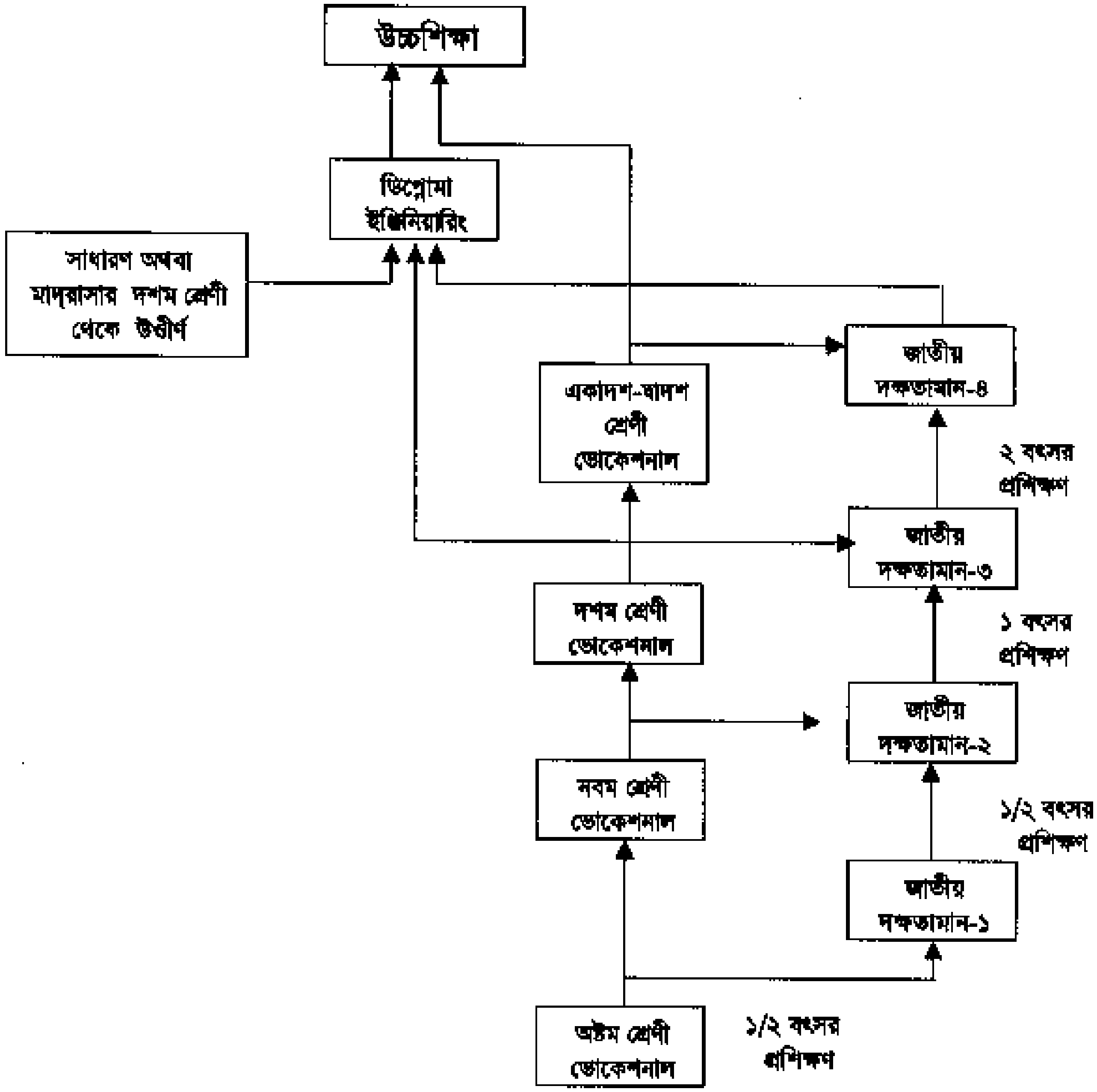

সংযোজনী-৫

সারণী - ১

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ বাস্তবায়ন ঃ ২০০৯/১০-২০১৭/১৮ সময়ে প্রাক্কলিত অতিরিক্ত ব্যয়

১.	অতিরিক্ত শ্রেণী কক্ষ জনিত ব্যয়	
	• প্রাথমিক ঃ ৮৫,০০০ বিদ্যালয় × প্রাক-প্রাথমিকসহ ৬ কক্ষ এবতেদায়ী মাদ্রাসা ঃ ১৮,০০০ প্রতিষ্ঠান × প্রাক-প্রাথমিকসহ ৬ কক্ষ মোট খরচ ঃ ৬১৮,০০০ কক্ষ × কক্ষ প্রতি ৫ লাখ টাকা	টাকা ৩০,৯০০ কোটি
	• মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল ও মাদ্রাসা (৩৪,৮৫৭ + ৮,১৪৩) × ৩ কক্ষ মোট খরচ ঃ ১২৯,০০০ কক্ষ × কক্ষ প্রতি ৭.৫ লাখ টাকা	টাকা ৯,৬৭৫ কোটি
২.	আসবাবপত্র টাকা ৫০,০০০ কক্ষ প্রতি	টাকা ৩,০৯০ কোটি
৩.	উপজেলা পর্যায়ে টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট (VTI/TTC)* বা কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন(৫০০ টি প্রতিটির জন্য ৮ কোটি টাকা)	টাকা ৪,০০০ কোটি
৪.	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক- (৮৫০০০ স্কুল + ১৮,০০০ মাদরাসা) × ১ জন মোট ১০৩,০০০ শিক্ষক। এই ব্যবস্থা পুরোপুরি বাস্তবায়ন পর্যন্ত মাসিক বেতন গড়ে মাসে ৭,৫০০ টাকা ধরা হল। যে সকল নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এবতেদায়ি মাদ্রাসা স্থাপিত হবে সেগুলোতে প্রাক-প্রাথমিকের জন্য শিক্ষক নিতে হবে। এগুলোর জন্য খরচ এখানে দেখানো হয়নি।	টাকা ৭,৪১৬ কোটি
৫.	প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বর্তমানে আছে ৫৪টি), প্রতিষ্ঠা করতে হবে ১০ টি; প্রত্যেকটি স্থাপনের খরচ ১৫ কোটি টাকা	টাকা ১৫০ কোটি
৬.	মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ (বর্তমানে আছে ১৪টি), প্রতিষ্ঠা করতে হবে আরও ৭ টি; প্রত্যেকটি স্থাপনের খরচ ১৮ কোটি টাকা	টাকা ১২৬ কোটি
৭.	সহায়ক সেবা ও কারিকুলাম প্রণয়ন; বছরে ৭৫ কোটি টাকা করে ৯ বছর	টাকা ৬৭৫ কোটি
৮.	বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন বছরে মোট ১০০০ কোটি টাকা করে ৯ বছর	টাকা ৯,০০০ কোটি
৯.	বর্তমান ধারণা করা যাচেছ না এমন খরচ	টাকা ২,৯৬৮ কোটি
	মোট টাকা	৬৮,০০০ কোটি

---

* VTI = Vocational Training Institute /কারিগরি বিদ্যালয়
TTI = Technical Training Institute

নোট ঃ নতুন যে সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে
সেগুলো নতুন আঙ্গিকে কক্ষ থাকতে হবে।

সারণী - ২

শিক্ষা খাতের জন্য প্রাক্কলিত সম্ভাব্য বরাদ্দ, ২০০৯-২০১৮

জাতীয় উৎপাদ (GDP) ঃ ২০০৮-০৯ সালে ৬১৫,০০০ কোটি টাকা (উৎসঃ অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমীক্ষা ২০০৯, পৃঃ২৩১।

বছর প্রাক্কলন (ক)	প্রকৃত ২০০৮-০৯	প্রাক্কলিত ২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	মোট ২০০৯/১০ থেকে ২০১৭-১৮
জাতীয় উৎপাদ কোটি টাকায় (বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি ৭%)	৬১৫,০০০	৬৫৮,০০০	৭০৪,১১৩	৭৫৩,৪০১	৮০৬,১৪০	৮৬২,৫৬১	৯২২,৯৪৯	৯৮৭,৫৫৬	১০৫৬,৬৮৫	১১৩০,৬৫২	
শিক্ষা খাতে সরকারী ব্যয়											
জাতীয় উৎপাদের শতাংশ	২.২৭%	২.৮০%	৩.২০%	৩.৬০%	৪.০০%	৪.৪০%	৪.৮০%	৫.২০%	৫.৬০%	৬.০০%	
যার মধ্যে ঃ সরকারী উৎস		২.৫২%	২.৮৮%	৩.২৪%	৩.৬%	৪.০০%	৪.৪০%	৪.৮০%	৫.২০%	৫.৬০%	
প্রকল্প সহায়তা		০.২৮%	০.৩২%	০.৩৬%	০.৪০%	০.৪০%	০.৪০%	০.৪০%	০.৪০%	০.৪০%	
টাকা (কোটি)		১৮,৪২০	২২,৫৩০	২৭,১২০	৩২,২৪৫	৩৭,৯৫০	৪৪,৩০০	৫১,৩৫০	৫৯,১৭০	৬৭,৮৪০	৩৬০,৯২৫ (৪০,১০৩)
যার মধ্যে ঃ সরকারী উৎস		১৬,৫৭৮	২০,২৮০	২৪,৪১০	২৯,০২০	৩৪,৫০০	৪০,৬১০	৪৭,৪০০	৫৪,৯৪৫	৬০,৬১৫	৩৩১,৩৫৮ (৩৬,৮১৮)
প্রকল্প সহায়তা		১,৮৪২	২,২৫০	২,৭১০	৩,২২৫	৩,৪৫০	৩,৬৯০	৩,৯৫০	৪,২২৫	৪,২২৫	২৯,৫৬৭ (৩,২৫৮)
প্রাক্কলন (খ) জাতীয় উৎপাদ কোটি টাকায় (বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি ৬%)	৬১৫,০০০	৬৫১,৯০০	৬৯১,০১৪	৭৩২,৪৭৫	৭৭৬,৪২৩	৮২৩,০০৪	৮৭২,৩৬৯	৯২৪,৭০০	৯৮০,২৩৬	১,০৩৯,০৫০	

রাষ্ট্রীয় উৎপাদনের শতাংশ যার মধ্যে ঃ সরকারী উৎস প্রকল্প সহায়তা	২.২৭%	২.৫০% ২.২৫% ০.২৫%	২.৮০% ২.৫২% ০.২৮%	৩.১০% ২.৭৯% ০.৩১%	৩.৪০% ৩.১০% ০.৩০%	৩.৭০% ৩.৪০% ০.৩০%	৩.৯০% ৩.৬০% ০.৩০%	৪.১০% ৩.৮০% ০.৩০%	৪.৩০% ৪.০০% ০.৩০%	৪.৫০% ৪.২০% ০.৩০%	
টাকা (কোটি) যার মধ্যে ঃ সরকারী উৎস প্রকল্প সহায়তা		১৬,২৮৮ ১৪,৬৮৮ ১৬০০	১৯,৩৪৮ ১৭,৪১৪ ১,৯৩৪	২২,৭০৬ ২০,৪৩৬ ২,২৭০	২৬,৩৯৮ ২৪,০৬৯ ২,৩২৯	৩০,৪৫১ ২৭,৫৮২ ২,৮৬৯	৩৪,০২৩ ৩১,৪০৬ ২,৬১৭	৩৭,৯১৪ ৩৫,১৪০ ২,৭৭৪	৪২,১৪৯ ৩৯,২০৯ ২,৯৪০	৪৬,৭৭৬ ৪৩,৬৫৯ ৩,১১৭	২৭৬,০৪০ (৩০,৬৭১) ২৫৩,৯৬০ (২৮,২১৮) ২২,০৮০ (২,৪৫৩)

নোট ঃ শেষ কলামে ব্র্যাকেটের ভেতরের সংখ্যাগুলো ২০০৯/১০ থেকে ২০১৭-১৮ সময়ের।

সংযোজনী-৬

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- শিম/শাঃ৪/শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন সেল-২/২০০৪/১২১ তারিখ ২৩-১২-১৪১৫ বঙ্গাঃ/০৬-০৪-২০০৯ খ্রিঃ দ্বারা শিক্ষানীতি ২০০০-কে অধিকতর সময়যোগী করে পুনর্গঠন করার লক্ষ্যে সরকার একটি কমিটি গঠন করে। দুজন কো-অপট করা সদস্যসহ কমিটির চূড়ান্ত গঠন নিম্নরূপ ঃ

কমিটি	স্বাক্ষর
চেয়ারম্যান জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী	
কো-চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি	
সদস্য-সচিব অধ্যাপক শেখ ইকরামুল কবির পরিচালক, প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন, নায়েম	
সদস্য অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহ উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর	
প্রফেসর আর আই এম আমিনুর রশিদ উপাচার্য, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর	
অধ্যাপক ড. সালেহা হালিম সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	
অধ্যাপক মুহঃ জাফর ইকবাল বিভাগীয় প্রধান, কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট	
অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	
অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	
অধ্যাপক ড. জারিনা রহমান খান লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	
অধ্যাপক নিতাই চন্দ্র সূত্রধর মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা	
অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমদ সভাপতি, বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, ঢাকা	
জনাব সিরাজ উদ্দীন আহমেদ অতিরিক্ত সচিব (অবসর প্রাপ্ত)	
জনাব মোঃ আবু হাফিজ অতিরিক্ত সচিব (অবসর প্রাপ্ত)	
মাওলানা অধ্যাপক এ বি এম সিদ্দিকুর রহমান (প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা, ঢাকা ও সিলেট)	
বেগম নিহাদ কবির ব্যারিষ্টার, সিনিয়র পার্টনার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ এন্ড এসোসিয়েটস	
অধ্যক্ষ এম. এ আউয়াল সিদ্দিকী সভাপতি, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি	
প্রফেসর শাহীন মাহবুবা কবির ইংরেজি বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা	

সংযোজনী-৭

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- শিম/শাঃ৪/শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন সেল-২/২০০৪/১২১ তারিখ ২৩-১২-১৪১৫ বঙ্গাঃ/০৬-০৪-২০০৯ খ্রিঃ দ্বারা শিক্ষানীতি ২০০০-কে অধিকতর সময়যোগী করে পুনর্গঠন করার লক্ষ্যে গঠিত কমিটিকে যেসকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী সহায়তাসেবা প্রদান করেছেন ঃ

ক্রমিক নং	নাম, ঠিকানা ও পদবী	সহায়তা সেবা
১	**এ কে এম মুনিরুল ইসলাম** সহকারী পরিচালক, নায়েম	র‍্যাপোটিয়ার
২	**ফরহাদুল ইসলাম ভুঁএগ** প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম	র‍্যাপোটিয়ার
৩	**মোঃ দাউদুল ইসলাম** বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ	শব্দ বিন্যাস
৪	**বিদ্যুৎ কুমার বিশ্বাস** ব্যক্তিগত সহকারী, নায়েম	শব্দ বিন্যাস
৫	**মোঃ আলমগীর হোসেন** এম এল এস এস, নায়েম	এম এল এস এস